১৯৪৫

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪৫। ২৯শে পৌষ, ১৩৫১। শনিবার।

সকালে বাঁশবন বেড়িয়ে এসে রোদে লিখতে বসি। তারপরে গতরাত্রের রান্না মাংস খেয়েই স্কুল। সকাল সকাল এলুম। মীজানুর রহমান 'জাগরণ' সবুজ সংখ্যা পাঠিয়েছে। এসে একটু ঘুমিয়ে পড়ি ও আত্মকথা পড়ি। তারপর এলেন Captain চৌধুরী ও রমেশবাবু। পাটনা ও অন্যান্য স্থানের গল্প হল। সন্ধ্যায় শ্যামাচরণদার বাড়ি গিয়ে [দেখি] হর আজ নতুন চাকুরি করে বাড়ি এসেচে। অনেক কথা হল। তারপর ইন্দুর বাড়ি হরিপদদা, ফণি কাকা সকলে বসে গল্প। রাত্রে খুব শীত। খাওয়ার পর— ?পুলি পিঠে হয়েছিল রাত্রে—খেয়ে লিখি। আজ সংক্রান্তি। কখনো এমন দিনে বারাকপুর থাকিনি। এসময় সরস্বতী পূজার চাঁদা আদায় করতুম। সরস্বতী পুজোর সময় বাড়িআসতুম। জীবনে বহুকাল পরে এখানে এদিনে।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১লা মাঘ, ১৩৫১। রবিবার।

সকালে উঠে বাঁশবনের পথ থেকে বেড়িয়ে ফিরে চালকী বারিকের বাড়ি। ভীষণ শীত। তবে আজ রোদ উঠেচে— আমাদের এদিন কালাপানি। রস নিয়ে এল বারিকের ছেলে। রোদে বসে লিখি। তারপর ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি বাঁশতলার ঘাটে।

সেই রকম নীল আকাশতলে

প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে

হোথা কোথা কতদূরে ?ওমিক্রন সেটি ঘোরে

সঙ্গে তার সুভদ্র বামন।

ভগবানের কথা এই বনতলে স্বতঃই মনে আসে। Idea রূপী ব্রহ্ম। কে এসব সৃষ্টি করলেন— কি অপূর্ব সৌন্দর্য। তুমিই থাকো চিরজীবী হয়ে। মাদৃশ ক্ষুদ্র জন্তুর থাকা-খাওয়ার মানে কি ?

বনগাঁর গুরুপদ এল। টাকা দিয়ে গেল। আংটি নিয়ে গেল। আমি হাটে গিয়ে পাটালি কিনে আনলুম। ওবেলা পিসিমার বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল, ফণিকাকা, ইন্দু আমরা সবাই। হাটে গিয়ে তখন সংঘ দেখি। তারপর ?পণ্ডিতের সঙ্গে ফিরি। ফিরে কুমোরপাড়ার পথ দিয়ে সোজা গিরিনদার বাড়ি বসে তিনু পাগলার বকবক শুনি। ফিরে বাড়ি এসে উৎকৃষ্ট আওটাপুলি খাই কালকার বাসি। গজেন মিত্রেরা এল না। রাত্রে ইন্দু ও হরিপদদার ওখানে গল্প।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১২ই মাঘ, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

বাঁশবনে বেড়িয়ে আসতেই ফণিকাকা ও অমূল্য জেলে এল। বনগাঁ যাবে ওরা। কাল আপিসে যেতে ওরা রাজি নয়। ক্রমে এল অমূল্য মুহুরি, গজন, গুড়ে মোল্লা। বেধে গেল গজনের সঙ্গে গুড়ে মোল্লার সঙ্গে। স্কুল দুটোয় ছুটি। সোজা হেঁটে বনগাঁ। পথে একটি ছেলে চালকীর কাছে আমায় ধরলে। সুধীরদার সঙ্গে দেখা চাঁপাবেড়ের সাঁকোয়। We smoked together—তারপর এলুম টাউন হলে। মিটিং হয়ে গেল মধুসূদনের জন্মতিথি নিয়ে। বঙ্কিম সেনের বক্তৃতা। ক্যাপ্টেন চৌধুরী, রমেশবাবু ও আমি মন্মথদার বাড়ি চা খাই। বঙ্কিমবাবুও এলেন। ওরা চলে গেল ললিতবাবুর বাড়ি পার্টিতে। গত সপ্তাহে ঠিক এমন দিনে ধলভূমগড়ে পার্টি হচ্চে, চাকুলিয়াতে সভা। সুরেনের বাড়ি গল্প। ওখান থেকে এলুম আবার লিচুতলায়। সন্ধ্যায় বসে বহুদিনের মতো আড্ডা। যতীনদা, মন্মথদা প্রভৃতি। তামাক খাই। গত সপ্তাহে ঠিক এই সময়ে ধলভূমগড়ে টি-পার্টি হচ্চে। কৃষ্ণানের বাড়ি। অচিরা বল্লে—কত গান লিখে রেখে দিলুম, ওরা আমায় ডাকলে না।

লিচুতলায় এল সাধু, গুরুপদ। ওখান থেকে ডাকবাংলো [—] মোটরে রমেশবাবু ও আমি জোড়া বটতলা। গত সপ্তাহে এ সময়ে চাকুলিয়া যাচ্চি মোটরে। বাড়ি গিয়ে দেখি তিনু গল্প করচে। ইন্দুর ওখানে বসে এলুম। অপূর্ব জ্যোৎস্নারাতে। খেতেশুতে রাত ১১টা।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৩ই মাঘ, ১৩৫১। শুক্রবার।

শীত কম। রোদে বসে লিখি। আবুল কাশেমের বাবা গুড় দিয়েছিল, সেই আবুল কাশেম এল। স্কুল। মৌলভী সাহেবের খাওয়াদাওয়া। সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠলে বাড়ি এসেই বাঁশবনের পথে—ফণিকাকার জমিতে। চা খাই বাড়ি বসে। খোতন গল্প করচে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে ভূতের গল্প শুনি। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না—আজ শীতও কম। অনেক রাত পর্যন্ত খেয়েদেয়ে জাগি।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৪ই মাঘ, ১৩৫১। শনিবার।

রোদে বসে লিখি। সেখানেই খাই। শীত কম। বাড়িতেই স্নান করে খাওয়াদাওয়া করি। স্কুলে গিয়ে ধার্য হল A.B.T.A.-র শিক্ষকেরা আসবেন। Feast হবে। বাড়ি এসে ঘুমুই। বন্ধু এসে ডাকাডাকি করচে। অশত্থতলায় মিটিং। সেখান থেকে এসে ফণিকাকার সঙ্গে মাঠের দিকে বেড়াতে যাই জ্যোৎস্না উঠলে। দু-জায়গায় সত্যনারাণের সিন্নি। ইন্দু রায়ের বাড়ি থেকে তুলসীর বাড়ি যাই সত্যনারাণের সিন্নিতে। সেখান থেকে শ্যামাচরণদার বাড়ি। অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রি। এঁচর দিয়ে কই মাছ দিয়ে রান্না।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৫ই মাঘ, ১৩৫১। রবিবার। বারাকপুর—মড়িঘাটা

সকালে উঠে লিখতে লিখতে লোক এসে পড়ল—পিন্টা, দেবেন—বেরুন, বেরুন, দেরি করবেন না। বেরুনো হল ৯।।০ টার সময়। এক নৌকো লোক বোঝাই। মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে অম্বরপুরের ঘাটের দৃশ্য খুব ভালো। মনোর মেয়ে কেবল বলচে, জ্যাঠামশাই, আমরা চলুন মোল্লাহাটি খেয়াঘাট দিয়ে হেঁটে যাই। ঐ সেই ডাকবাংলা, ওই সেই ঘর, ওখানে সেদিন চা হয়েছিল। উঁচু পাড় পাঁচপোতার বনভূমি বেশ। মড়িঘাটার বাঁকের মাথায় মড়িঘাটা। এক জায়গায় চিতা জ্বালিয়েচে, অনেক লোক। তার পরেই মড়িঘাটা, কল্যাণীকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্চি। মেলার মধ্যে গিয়ে উপেন ভটচাজ পুজো করচেন দেখা গেল—তিনি আমায় দেখে বড় খুসি, বিভূতিবাবু এয়েচেন—ওমা বিভূতিবাবু এয়েচেন। সন্দেশ দিলেন কল্যাণীর ও আমার হাতে। ওপারে গিয়ে সুন্দর একটি সাধুর আশ্রম। আমাদের আশ্রয় দিলেন। ছোট্ট ২।৩ খানা মাটির ঘর, পরিষ্কার লেপাপোঁছা, একটি চখাবালির ঘাট। সেখানে স্নান করা গেল কল্যাণী ও আমি। কুল পেড়ে আনলে ওরা। সবাই মিলে খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকো ছাড়া গেল। কল্যাণী ও আমি ছইয়ের বাইরে। পূর্ণচন্দ্র উঠল। দুদিকের বন্যেবুড়োগাছের কি অপুর্ব শোভা ! এমন জ্যোৎস্নারাত্রের নদীভ্রমণ অনেকদিন হয়নি—বিশেষ করে মোল্লাহাটির পরে কখনো নৌকোয় আসি নি। কল্যাণী বল্লে—"ওই কে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সাদা মতো মানুষ। একদিকে দপ দপ করচে শুক্রতারা, পশ্চিম আকাশে, একদিকে পূর্ণচন্দ্র। কাশ ও নলখাগড়া বনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ বার হচ্চে ইসমাইলপুরের মতো।

নির্জন চরভূমির অপূর্ব শোভা ! শীতে যেন যাচ্চি বাইরে। আর কতদূর ?ওই সবাইপুরের বাঁক, তারপর কাঁচিকাটার বাঁক—তারপর। রাত দশটার সময় রায়পাড়ার ঘাটে নৌকো লাগল। জেলির নতুন বাড়ির পথ দিয়ে আমরা এলুম চলে। তখন গ্রাম নিশুতি।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৬ই মাঘ, ১৩৫১। সোমবার।

উঠতে দেরি হয়ে গেল। রোদ গাছের মাথায়। স্নান করে এলুম করুণার সঙ্গে গিয়ে। বাঁশতলার ঘাটে। বসন্তের আমেজ একটুও নেই বাতাসের। কড়া শীত। সারাদিন স্কুলে হাওয়া বইল পশ্চিমে। রোদ মিষ্টি লাগে খুব। গৌরের দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে বাড়ি এলুম। পায়েস নিয়ে এল কল্যাণী—নতুন গুড়ের ?ফকিরচাঁদ শিউলির। আজ বসে ভাবছিলুম আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি চেপে যেমন আমরা নিচু হয়ে ছোট হয়ে ছোটছেলেদের মধ্যে দেখা দিই, মিশি, ভগবান তেমনি তাঁর বিরাট শক্তি আবৃত করে নবরূপ ধরে নরলীলা করেন জীবের শিক্ষার জন্যে। তিনি নাশেখালে কে শেখাবে ?এ অনুভূতির জিনিস। সব ব্যাপারেই আজকাল মনে হয় আমার—তাই ভাবলুম। সুন্দর রাঙা রোদ, অপূর্ব শোভা হয়েচে যখন ফণিকাকার বাঁশবনে গেলুম সন্ধ্যার আগে বেড়াতে। কল্যাণী ও আমি গল্প করলুম বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত। শ্যামাচরণদার বাড়ি ও ইন্দুর বাড়ি। ইন্দু পাগলী কুমোরনীর গল্প করলে। অনল (?)বোষ্টুমির শাঁখা পরানোর গল্প।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৭ই মাঘ, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

বাঁশবনের পথ বেড়িয়ে আসাতে একটু বেলা উঠল। Death of noble Godavary পড়ি। বেশ লাগে। স্কুলে। পথে পিওনের বৌয়ের সেই প্রেমিককে কে মেরেছে খুব। স্কুলে হঠাৎ ভগবানের কথা মনে হল—God of Eternity. চলে এলুম মাঠে, দূরের দিকে চেয়ে রইলুম। জিনিস কিনে চলে এলুম। বাড়ি এসেই কুঠীর মাঠে ও নদীর ধারে বসে ভগবানের শিল্পের সৌন্দর্য লক্ষ্য করি। দেখি মিতে ডাকচে। চারাবাগানে বসে ও আমায় বল্লে—বোস এখানে। ঘাটশিলা গিয়েছিল, তার গল্প করি। বাড়ি এসে চা খেয়ে গল্প করচি—এমন সময়ে ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও রমেশবাবু এলেন। বিভূতি গল্প করলে। পড়লে ?ওরা গেল সন্ধ্যার পরে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে ফণিকাকা ও ইন্দু গল্প করি।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৫। ১৮ই মাঘ, ১৩৫১। বুধবার।

বাঁশবনে বেড়িয়ে এসে লিখি। স্নান হল না। স্কুলে গেলুম। দেরি হয়ে গেল। টিফিনের সময়ে স্কুলের পেছনে বটগাছটার কাছে দূরস্থিত মাঠের দিকে দৃষ্টি রেখে মনে হল, শীত যাচ্চে, বসন্ত আসচে—এটা লক্ষ্য করেছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে থাকতে। বহুদিন পরে যেন সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্কুল থেকে ফিরে দেখি পাঁচি এসেচে। সে 'দেবযান' পড়ে বল্লে—আপনি একখানা বই লিখেছেন, যা চিরকাল থাকবে। আপনার নাম হয়তো এখন হবে না। দুশো বছর পরে আপনার এই বইয়ের নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ হবে। গুড় কিনলুম চালকীর সামসুদ্দিনের কাছে। ছেলেরা এল স্কুলের। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে দেশবিদেশের গল্প হয়। পটল এসে বল্লে, খোতন দেবেনের লেখাপড়া হবে না। বাড়ি এসে কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খাই। পিসিমা সরুচাকলী দিয়েচে। পাঁচীর সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করি। কল্যাণী বলে—মানকু, তুমি আমার বুড়ো বুড়ো। তোমাকে এত ভালোবাসি কেন ?আর কাউকে মানকু বলে ডাকতে পারতুম না।

ভগবানের অসীম দয়া যেন ওর রূপে নেমে এসেচে। কৃষ্ণের যতেক লীলা তার মধ্যে সর্বোত্তম নরলীলা, নরদেহ সর্বদেহসার। পাঁচী বলচে—দুশো বছর পরে লোকে বলবে—এক দেবমানব এসেছিল।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ১৯শে মাঘ, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে বাঁশবন থেকে ফিরি বেড়িয়ে। এদিন বেড়াতে যাই ছিরেপুকুরের ধারে। এসে লিখি অথৈ জল। স্নান করতে যাই নদীতে। সেই কুলগাছের কুল মনে মনে ভগবানকে নিবেদন করি [—] হাতে কতকগুলো তখন রয়েচে। স্কুল। স্কুল থেকে রানাঘাট by train—অনেক দেরি করলে খোতন বনে, কিন্তু সুরমা মেল পাওয়া গেল, তাঁকে ধন্যবাদ। বুদ্ধদেবের বাড়ি পৌঁছে কালিদাসের সময় সম্বন্ধে গল্প। ভবভূতি ও কালিদাসের তৎকালের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে শ্লোক। Ice age সম্বন্ধে আলোচনা। বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য দ্বারা বোঝা গেল Dr. Fleet কালিদাসকে second Century B.C.তে নিয়ে গিয়ে ফেলেচেন কারণ ? Medallionএর তারিখ ওই। গোপালনগর থেকে হেঁটে আসবার সময়ে সন্দেশ নিয়ে এলুম। নুটুর চিঠি এসেচে।

বাড়ি এসে চা খাই। মাংস নিয়েচে কল্যাণী। মাংস দিয়ে ভাত খাই। তারপর আলো জ্বেলে চিঠি পড়ি—'বর্ষশেষ' বই পড়ি।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫।২০শে মাঘ, ১৩৫১। শুক্রবার।

সকালে উঠে চা খেয়ে গিরিন সোমের বাসা। রমেশবাবু ছিল। তারপর গেলুম সজনীর বাড়ি। সে নেই। ফিরে কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে তারাপদ রাহার সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে গল্প করে বসে বসে এদের দোকান আর খোলে না। অপূর্ববাবুর সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করি। ওদের দোকানে বসে গল্প। হেমেন রায় এসে দশটা টাকা নিয়ে গিয়েচে। আর আসেনি। মিত্র ও ঘোষে প্রবোধ সান্যাল 'দেবযান'-এর অজস্র প্রশংসা করলে। মনোজ বসুর সঙ্গে মোড়ে দেখা। সে চা খাওয়ালে এক দোকানে। 'দেবযান'-এর অজস্র সুখ্যাতি। বল্লে, বাংলা সাহিত্যে যে কতদিকে প্রচেষ্টা চলচে, 'দেবযান' পড়লে বোঝা যায়। এক ভদ্রলোক 'দেবযান' পড়ে আমাকে দেখতে এসেছিলেন মিত্র ও ঘোষের দোকানে। ওখান থেকে ৫-৪০-এর ট্রেনে—বিশ্বনাথের (সতীশ কাকার ছেলে) সঙ্গে দেখা। দুজনে গল্প করতে করতে এলুম। সে চলে গেল। আমি একা গাড়িতে। বল্লুম, ভগবান, তোমাকে কেউ চায় না। অনেকে গালাগালি দেয় যেমন সেই ইংরেজি বইটাতে— ?—ইত্যাদি। অথচ তুমি এত করেচ বিশ্বের জন্যে। হে অবহেলিত দেবতা, তুমি এসো, আমি তোমাকে স্থান দেব মনে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২১শে মাঘ, ১৩৫১। শনিবার।

খুব শীত। বারাকপুরে বাঁশবনগুলি মন্দ নয়, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি লিখচি।

'অথৈ জল' লেখা শেষ করে চিঠি লিখি অনুকূলকাকাকে। তারপর ওগুলো বাঁধার ব্যবস্থা সেরে বিদ্যুৎবেগে স্নান করে আসি শীতে।

তারপর স্কুলে গিয়ে করুণার সঙ্গে ও হাবুর সঙ্গে দেখি স্কুলের দোরই খোলেনি।

শনিবার। বড্ড শীত। রোদে বসে বসে পড়াই। হু হু হাওয়া। কলিমুদ্দি মারা গিয়েচে শুনে বড়ই দুঃখিত হই। বাড়ি এসে শুয়ে ঘুম দিলুম। সইমা ও পাঁচী এল (পতিতের মা)। ওরা চা খাচ্চে—খুব খুসি। ওরা চলে গেলে কল্যাণীকে নিয়ে বাঁশবনে কুল কুড়ুতে যাই। এখনো রাঙা রোদ রয়েচে অথচ বড্ড শীত। গিরিনদার বাড়ি গিয়ে গল্প করি। কিশোরকাকা সেখানে। ঝালকাটির রজনী মুখুয্যে নাকি সূর্যিমামার কে হয়—ভগ্নিপতি নাকি। ইন্দু বাড়ি নেই—সেখান থেকে হরিপদদার বাড়ি বসে গল্প করি। গরুতে মুসুরি খাওয়ানোর মোকর্দমা একটা এসে জোটে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২২শে মাঘ, ১৩৫১। রবিবার।

ভীষণ শীত। উঠে বেড়িয়ে এসে লিখি। রোদে বসে দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর ইতিহাস পড়ি। এমন সময় নগেন, পুঁটে, গনে, সহকাল এল। ওদের মোকর্দমা শুনে ইন্দু রায়ের বাড়ি গিয়ে বসি অনেকক্ষণ। তারপর এসে কল্যাণী ও আমি ফণিকাকার বাঁশতলা দিয়ে স্নান করতে যাই। ওপাড়ার ঘাটে স্নান করি। এসে রোদে বসে খেয়ে ঘুমুই। মিতে এল ৩টার সময়। ওকে নিয়ে জল খেতে বেরুই নদীর ধারে। নিবারণের বেগুনক্ষেতে বসি। ফিরে এসে দেখি স্কুলের ছেলেরা সব এল। গিরিনদা এলেন—লাউমাচা দেখে গেলেন। মিতে চলে গেল। আমি আলো জ্বেলে পড়তে বসি—তারপরই ফণিকাকার বাঁশবনের মাঠের দিকে সান্ধ্য ?দেখতে যাই। এই নিস্তব্ধ অন্ধকারপ্রায় বাঁশবনের মাথায় শুকতারা জ্বলচে, নির্জন চারিদিক—এই গ্রামে কত সন্ধা এমন নেমেচে কমল রায়, গিরিশ বাঁড়ুজ্যের সময় থেকে। বাড়ি এসে আবার পড়ি। ভগবানের কথা মনে হয়। তারপর যাই ইন্দু রায়ের বাড়ি। ফণিকাকা এল। যুদ্ধের গল্প হয়। ভীষণ শীত বাড়ল। পায়েস করেচে কল্যাণী, সেই খেয়ে মোমবাতি জ্বেলে পড়ি—শুয়ে পড়ি তারপর।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৩শে মাঘ, ১৩৫১। সোমবার।

ভীষণ শীত। লেপের মধ্যে বসে দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পড়ি। স্কুলে যেতে একটু দেরি। শোভান এল, বারিক এল। হরিপদদা বল্লে—চল, কাল সকালে কলকাতায়। ভোরের ট্রেনে। আমি হেডমাস্টারকে গিয়ে সেই রকম বল্লাম। তিনিও কাল কলকাতায় যাবেন। আমাকে অনুরোধকরলেন না যেতে। আজ যখন যাচ্চি, রজন [?]কামার বিয়ে করে এল। সেই রজন ! স্কুলে কানপুরের 'প্রতাপ' পেলুম—তাতে আমার কমিউনিজম সম্বন্ধে মতবাদ ছাপিয়েচে। ফিরবার পথে যতীন পরামানিকের দোকানের পাশ দিয়ে মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে ফিরি। গত বর্ষাকালের পরে আর এ পথে কখনো আসিনি। বাড়ি এসে ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে গল্প করি। ফিরে এসে কুল খেতে যাই ফণিকাকার বাঁশবনের মাঠে। স্কুলের ছাত্রেরা এসেচে। আমি ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি সন্ধ্যার পরে। আর ছিল পটল।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৪শে মাঘ, ১৩৫১। মঙ্গলবার। বারাকপুর—কলিকাতা

সকালে উঠে বাঁশবন বেড়িয়ে এসে বসে লিখি। তারপর নলে নাপিতকে এনে দাড়ি কামাই। স্নান করে এলুম নীলু, দেবু, খোতনের সঙ্গে করুণাও ছিল। বাঁশতলার ঘাটে। স্কুলে হেডমাস্টার নেই। হৈ-হৈ চলচে। ৪টার ট্রেনে রানাঘাট। খিনুদের বাসায় কেউ নেই। সুরমা মেলে কলকাতা। আজকাল সন্ধ্যাতেই গিয়ে পৌঁছোয়। গজেনদের বাড়ি। সুনীতিবাবু, নলিনী সরকার, প্রবোধ সবাই মিলে বসে আড্ডা দেই, তারপর খেতে বসি। গ্রীক কবিতা আবৃত্তি করি। খেয়ে প্রবোধের বাড়ি শুই রাত্রে।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৫শে মাঘ, ১৩৫১। বুধবার। কলিকাতা

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে প্রবোধের টেবিলে 'Hinduism at a Glance'বইখানা পড়ি। ভালো বই। ভগবানের ভক্তিপথের বিষয়ে লিখেচে—Love of God বড় জিনিস। ওখান থেকে ওর স্ত্রী আলাপ করলেন। গৌরীর বাড়িতে গৌরীর স্ত্রী ও ভূপতির এক মাসিমা এলেন। চা খেয়ে বেরুই। কানুমামার সঙ্গে পথে দেখা, দিল্লিতে অরুণেন্দ্রমণির বাড়ি গিয়েছিল। মণি বোসের বাড়িতে এসে ?ও মণির সঙ্গে গল্প করি। ওখান থেকে কল্যাণী ?আনতে বল্লে সবিতা। Lady Bose-এর বাড়ি এসে গল্প করি। 'দেবযান' সম্বন্ধে Lady Bose যথেষ্ট বল্লেন। ফিশার এসে বলেচে এদেশে এখনো ভগবানের আদর খুব। বীণা বলে ওঁর এক ভাইঝি। ওখান থেকে সজনীর বাড়ি। সজনী নারায়ণগঞ্জে, ঢাকা গিয়েছিল। থাকতে বল্লে, বলাই আসবে। বল্লুম, চিঠি দিও, ভাগলপুর যাবো। এলুম বিডন স্ট্রীটের পাবলিসিটি হোমে নৃপেনের

ওখানে। কাত্যায়নীতে ও বরেন লাইব্রেরিতে। মায়ের নামে উৎসর্গ করা 'অপরাজিত' বেরিয়েচে। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে ওদের দোকানে দেখা। চা খেলুম। ফণির সঙ্গে কথা। রমাপ্রসন্নের বাড়ি এসে ম্যানোলা ও ওর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প। ৫টার ট্রেনে গোপালনগরে। বোর্ডিং থেকে আলো নিয়ে বাড়ি। দেবেন, খোতন বসে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলে।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৬শে মাঘ, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার। বারাকপুর

কাল প্রবোধের বাড়ির দরজা খুলে ভোরবেলা যখন 'Hinduism at a Glance'পড়ছিলুম তখন যেমন ছিল কুয়াসা, আজও তেমনি। কুয়াসা ভেঙে রোদ উঠতেই ভেটকি মাছ নিয়ে এল হাজরি। ময়রা বৌ এল গোপালনগর থেকে। সে থাকবে আমাদের ঝি। নেয়ে আসি সাবান নিয়ে। মাছের ঝোল খেয়ে স্কুলে গিয়ে দেখি বহু দেরি। হেডমাস্টারটা ভীতু বলেছিলুম বলে হেডমাস্টারের বড় রাগ। মাঘ মাসে কপি সস্তা হবেই।

বারাকপুর আর কলকাতা। এই ঘুলি ঘুলি আঁধার সন্ধ্যা নেমে আসচে বাঁশের বনে—প্রথম বসন্তে কোকিল ডাকবে দুদিন পরে। ফণিকাকার বাঁশবনে স্তব্ধ আসন্ন সন্ধ্যা যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দুর বাড়ি বসি। গনে (কালুর ছেলে) এল। মোকর্দমার জন্যে পুঁটে শোভানের বৌকে হরণ করেছে। বাড়ি এসেই আবার হরিপদদার বাড়ি গেলুম তখনি। গজনকে ভোট দেওয়া নিয়ে সভা। বাড়ি এসে দেখি কল্যাণী, ভেটকি মাছ দিয়ে পোলাও হল। রাত্রে 'দেবযান' পড়ি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৭শে মাঘ, ১৩৫১। শুক্রবার।

সকালে বেড়িয়ে এসে কল্যাণীর পাশে বসে লিখি। ও ঘুমোয়—রোজ যেমন হয়ে এসেচে।চুল ছাটি [ছাঁটি] নাইনে—স্কুলে যাই। তাই বেলা হয়ে গিয়েচে। স্কুল থেকে বাড়ি। বরোজপোতার ডোবার ধারে সন্ধ্যার পূর্বে প্রদোষান্ধকারে যেন ভগবানের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব লক্ষ্য করলুম। ভগবানের নামের কি শক্তি, কি মহিমা—মনে হয়ে চোখে জল এল। সত্যিই কি বিরাট শক্তি তাঁর নামের ?সন্দেহ নেই।

আমার অবিশ্বাস দূর হল।

ইন্দু এসে সকালে গল্প শুনিয়ে দিল। তার ওখানে সন্ধ্যায় গিয়ে গল্প করি। গনে, ভনে কাল আমার সঙ্গে বনগাঁ যাবে। চা খাবো রমেশবাবুর ওখানে। হরিদার বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করবো। মন্মথদা যতীনদার কাছে যাবো, ফিরে আসবো। Supply Officer-এর কাছ থেকে permit নেবো শাড়ি ও ধুতির।

১৯৩৫ সালে আজ কুঠীর মাঠে picnic হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আজ দুবলাবেড়া forestএ বারোজ সাহেবের বাংলোতে গল্প করচি।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৮শে মাঘ, ১৩৫১। শনিবার।

সকালে উঠে ছিরেপুকুরের ধারে গিয়ে বসি। লিখি এসে রোদে। বাসি পায়েস কি সুন্দর লাগে। যখন ছিরেপুকুরে যাচ্চি উঠে, তখন ভগবানের নামের মহিমা ও শক্তি খুব বেশি, এ অনুভব করে চোখে জল এল। সে নাম যেন একবার উচ্চারণ করলে সহস্র কোটি পাপীতাপী উদ্ধার। পরেই মনে হল আমি মুক্তিকামী নয়, স্বর্গকামী নয়, পুণ্যকামী নয়, পুত্রকামী নয়, আমি বিত্তকামী নয়—আমি শুধু তাঁর সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দিবারাত্রি অভিনন্দন জানাই তাঁকে, ভালোবাসি তাঁকে—না নাম নিয়ে পারিনে। সুতরাং নারেম শক্তিতে আমার কি হবে ?স্কুলে মহাদেব রায়ের চিঠি এল। 'দেবযান' ভালো লেগেচে। এসে দেখা ছেলেরা এল। পুঁটের বৌ এসে কাঁদলে। আহা, এদের বুদ্ধি নেই। They are not sinners but like poor ignorant children !এদের জন্যে শতবার জন্মাতে প্রস্তুত আছি। বুদ্ধির দোষে এরা যা কিছু করে। ঐ মেয়েটি নির্দোষ। দুটো খেতে পরতে পাবে বলে পূর্ব স্বামীকে ছেড়ে আসে। শোভানও খেতে দিতে পারলে না। এখন পুঁটে খেতে দেয়—সেখানেই থাকবে। ঘরে কাঁপে আহাদ বুড়ো ওবেলা এসে বলচে ওকে ওর বৌ মেরেচে।

রোদ চড়েচে দুপুরে। শীত খুব কমেচে। নেই বল্লেই হয়। জুটবাবু এসে শ্যামাচরণদার বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা ও সভার জন্যে অনেক বললে।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ২৯শে মাঘ, ১৩৫১। রবিবার।

সকালে উঠে লিখি। ছিরের পুকুরের ওপারে মাঠে বেড়িয়ে আসি আজ। চা খেয়ে পুঁটের বনগাঁ। হরিদার বাড়ি ও Supply Officer-এর ওখানে। মন্মথদার বাড়িতে চা খাই ও সন্দেশ। দেবুর শ্বশুর এসেচেন, ওখানেই দেবুর পুনরায় বিবাহ হবে। রমেশবাবু বসে গল্প করলেন। ফটিক উকিল, সাবডেপুটি সব একত্র গল্প করি। কালোদের বাড়ি গিয়ে শেকল ঝমঝম করি। কালো এসে কথা বলে। বাড়ি এলুম, স্নান করলুম—তখনো জেলি খাচ্চে। বেলা ২॥০ টার সময় খেয়ে উঠি। শুই অনেকক্ষণ ও পড়ি—Wide World-এর Joe Davis's ?—ছেলেরা এল। আমি টরুর সঙ্গে গল্প করি গিরিনদার বাড়ি, কানপুরে হরেন ঘোষের সঙ্গে দেখা হল তা বলি। বাঁশবনে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় চুপ করে ভগবানের কথা ভাবি, যখন বাঁশবনের মাথায় একটি মাত্র তারা উঠেচে। ইন্দুর বাড়ি বসে জেলি, পটল, ইন্দু ও আমি উক্ত বিষয়ে গল্প করি।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫১ শুক্রবার।

সকালে উঠে বাঁশবনের পথে বেড়িয়ে এসেই গল্প 'শাবলতলার মাঠ' লিখতে বসি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লিখি। তারপর ফণিকাকা ও ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করে আসি। বেলা ১২টা।কল্যাণী ও আমি নাইতে গিয়ে বরোজপোতার দিকে একটা নতুন স্থান আবিষ্কার করি। একটা শিমুলগাছে ফুল ফুটেচে—বনের মধ্যে জায়গাটা পরিষ্কার। জায়গাটা বড় অদ্ভুত। দেখে অবাক হয়ে গেলুম। দুটি স্থান আবিষ্কার করা গেল—এই ছুটিতে। কুঠীর সেই লতাবিতান ও এই জায়গাটা। এসে বাসি পায়েস খেয়ে ঘুমুই। Twenty Years After পড়ি। ঘুম থেকে উঠে লিখে ইন্দুর সঙ্গে খড়ের চেষ্টায় নতিডাঙায় গেলুম। জীবনে এই প্রথমে নতিডাঙায় যাওয়া গেল। আর কখনো যাই নি। আবু তাহেরদের বাড়ি গিয়ে বসি। সেখানে প্রমার বাবা বসে আছে। একটা অশ্বত্থতলা, নিভৃত বনের মধ্যে বেশ সুন্দর জায়গা। বেলেডাঙার মধ্যেও জীবনে এতকাল যাইনি। আজ বেলেডাঙাও দেখলাম। একস্থানে খুব ঘেঁটুফুল ফুটে সুগন্ধ বেরুচ্চে কোকিল ডাকচে। যদিও খুব শীত। বাড়ি এসে কোথাও যাইনি। পুঁটিদিদির সঙ্গে গল্প করি ও লিখি। বিভূতির ভাই রাধুর বিয়ে। বিভূতি নিজে নিমন্ত্রণপত্র দিয়েচে লিখে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৫১। শনিবার। বারাকপুর-কলিকাতা

সকালে উঠে বাঁশবন থেকে বেড়িয়ে 'মৌচাক' (?)লিখতে বসি। কারণ দিতে হবে আজই। স্নান হল না। স্কুল। বাঁশবনে বেড়াতে গেলুম স্কুলের পেছনে।

সুরমা মেলে কলকাতা। নীরদবাবুদের বাড়ি দেখে কানুমামার বাসা এসে পড়ি 'Droll Stories by Balzac.

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫১। রবিবার। কলিকাতা

ভোরে উঠে চা খেয়ে নীরদ দাশগুপ্তের বাড়িতে যাই। নীরদবাবুদের সঙ্গে গল্প। প্রমোদবাবুকে phone করা গেল। তিনি এলেন। অনেকদিন পরে দেখা। একসঙ্গে চা খেয়ে আমি হেঁটে গেলুম ঢাকুরিয়া। তখন ১০॥ টা। তখুনি যদি মণি বোসের বাড়ি যাই, তবে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়। তা আমি কি করে জানবো ?অনেকদিন অন্নদার সঙ্গে দেখা হয় নি। গজেনদের বাড়ি এসে দেখি কেউ নেই, সুমথর শ্বশুরের বাড়ি। সেখানে সবাই মিলে আড্ডা। সুমথর স্ত্রী মৃদুলা বড় যত্ন করলে। খাওয়ালে দাওয়ালে। ওখান থেকে বাসায় ফিরে মায়াদিদির সঙ্গে দেখা। এক ভদ্রলোক ভীষ্মদেবের অনুকরণে গান গাইলেন। বাণী রায়ের বাড়ি অনেকক্ষণ গল্প করি। বাণীর বাড়ি থেকে বাসায় ফিরে দেখি কানুমামার বাড়িতে অনিল চক্রবর্তী বসে আছে। তার সঙ্গে গল্প কিছুক্ষণ। উঠে দুজনে হেঁটে নীরদবাবুর বাড়িতে এলুম। ওবেলা নীরদবাবুর বাড়িতে দুটি ছেলে রানী শংকরী লেন থেকে এসে দেখা করলে। রাত্রে নীরদবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। অনেক রাত্রে ট্রামে এলুম।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৫১। সোমবার। কলিকাতা চালকী—বারাকপুর।

ভোরে উঠে চা খেয়ে ট্রামে সজনীর ওখানে। শুনি বনফুল কাল চলে গিয়েচে। চা খেয়ে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি। হেডমাস্টার বল্লেন—বাড়ির সংবাদ খারাপ। শান্তর অসুখ। ট্রামে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেলুম। ওখান থেকে M.C.ও গজেনের দোকানে এসে চা কিনলুম। ট্রেনে বনগাঁ। সুরেনের বাড়ি হয়ে পঞ্চা মাস্টারের গাড়িতে চালকী। অনেকদিন পরে মনে হল আবার চালকী আছি। শান্ত atmosphere—ঘেঁটু, লেবুফুলের সুগন্ধ বাতাসে। বসন্তের আগমনে অপরাহ্নগুলি [অপরাহ্ণগুলি] সুন্দর হয়ে উঠেচে। কলকাতার হৈ চৈ থেকে এই যে ব্যাপার—হঠাৎ অন্যজগতে এসে পড়া যেন এটি। কোলাহলমুখর জনপরিবেশ থেকে শান্ত তরুলতা ও বসন্ত। লোকজগতে এলুম। পঞ্চা মাস্টারের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম পুরোনো দিনের মতো। শান্তর অসুখ। ছেলেরা দেখচে। উমা আছে। তারাপদর সঙ্গে গল্প করি। খাবার খাওয়ায়। তামাক খেয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে বাড়ি। নিমাই এসে সাইকেলে ধরলে গাজিতলার পথে। কল্যাণী দেখে খুব খুশি। বলে—মানকু বুড়ো।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে লিখি। স্নান করে এলুম বাঁশতলার ঘাট থেকে। স্কুল থেকে অন্নর বাড়ি চা খেলুম। বারিকের গাড়িতে চালকী। অনেকদিন পরে স্কুল করে ফাগুন মাসে চালকী গেলুম। কল্যাণী আসচে পথে ছেলেদের সঙ্গে। পথে পথে আম বউলের গন্ধ। বাড়ি পৌঁছে বসে শান্তর অবস্থা দেখি। রাত ৮।।০ টায় চলে আসি। তখন নিমাই ও শ্যামলেন্দু পথে। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৫১। বুধবার।

বসন্তের প্রারম্ভে। কোকিল ডাকচে। স্কুল থেকে চালকী। পথে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা। সে ও রবি যাচ্চে। আমরা পালিত পাড়ার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। বেশ জঙ্গল কাটিয়ে বাস করচে। একঘর লোক বাস করচে জঙ্গল কাটিয়ে। বৈদ্যনাথবাবু এসে গল্প করলেন। জ্যোৎস্নায় চলে এলুম। লেবুফুলের সুগন্ধ, আমের বউলের সুগন্ধ। অনিলবাবু আজ চিঠি দিয়েচে। সেদিন আমাকে পেয়ে খুব খুসি হয়েচে ইত্যাদি। কল্যাণী ও আমি গল্প করি রাত্রে।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

শীত বেশ আজ। স্নান করতে গেলুম নদীতে। কুল কুড়িয়ে খাই। স্কুল। মল্ল চলে যাচ্ছে। হাট করি অনেকদিন পরে। কপি একটা চোদ্দ পয়সা। শাঁক আলুর সের আনা। হেঁটে চালকী। আমের বউলের গন্ধ। ঘেঁটুফুল ফুটেচে—কোকিল ডাকচে। যেন আমি এতদিন চালকী আছি এবং চালকী থেকেই স্কুল করচি। আমার যেন বাড়ি নেই। আবার চালকীর পেছনের দিকেও বাঁশবনের যাই বেড়াতে। যে বন থেকে কাঠ আনতুম, পালিতপাড়ার সে জঙ্গলে লোক বসেচে।

বাড়ি এসে লুচি করলে কল্যাণী। রান্নাঘরে বসে খেলুম। তোতা ও টুলু এসে খেলে। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। গোনা যাত্রা হচ্ছে গ্রামে। করুণা এল গোনাযাত্রা শুনতে, চমৎকার রাত্রি বটে। অনেকরাত্রে উঠলুম। গোনাযাত্রা হচ্চে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫১। শুক্রবার।

সকালে উঠে কল্যাণীকে জাগিয়ে দিলাম। ও উঠল না। শেষরাত্রে গোনাযাত্রা দেখে করুণা এল, তাকে দোর খুলে দিয়েচি, ঘুম ভালো হয় নি। স্নান করে এসে স্কুল। স্কুল থেকে চালকী যাবার সময়ে সেই পালিতপাড়ার পথে অপূর্ব সৌন্দর্যভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বলাই বলে একটা লোকের বাড়ি গিয়ে তামাক খাই। উমা ডাব পাড়চে, নিমাই গাছে উঠেচে। আমি বিকেলে সেই বেলতলায় গিয়ে বসলুম। পালিতপাড়ার পথে ঘেঁটুফুল হঠাৎ একটা দুটো বনের মধ্যে কি শোভাই হয়েচে। ওরা রিক্সা নিয়ে এল, কারো ও বিমান। জ্যোৎস্না উঠেচে। লেবুফুলের ও আম্রমুকুলের সৌরভের মধ্যে আবার স্কুল। হরেন কবিতা শোনালে বোর্ডিং-য়ে। খাওয়ার ঘরে বসে মল্ল, সুধীরদা, দত্ত, পণ্ডিত সবাই এক সঙ্গে খেয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে চলে এলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে চলে এলুম হু হু করে। কানাই মালের বাড়ির কাছে একটা মালী বলচে—ও বাবু, কনে যাচ্চেন। আমি যাবো। একটা কালো মতো কি দেখলাম। ভয় করচে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ইন্দু রায় ভাত খাচ্চে। বাড়ি এসেই দেখি পিসিমা বসে আছেন।

১৮ই মার্চ, ১৯৪৫। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৫১। রবিবার।

সকালে ওরা এল না। আমি লিখে উঠে ফণিকাকার বাড়ি ও তারপর গিরিনদা'র বাড়ি গিয়ে গল্প করি। গজেন, নলিনীদা, সুমথ ও ইন্দু এল। বকুলতলায় বসে গল্প ও গান করি। নাইতে গেলুম আমাদের ঘাটে। ওদের সঙ্গে বনগাঁ গেলুম। নৌকায় অনেকদিন পরে গেলুম। মিতের সঙ্গে দেখা মন্মথদার ওখানে। মিতের বাড়ি চা খেলুম। মন্মথদার ওখানে ফিরে এসে তামাক খাই। পটলের দোকানে বিশ্বনাথ বসে, কালো বসে। ওরা চিঠি দিলে মন্মথদের 'দেবযান' সম্বন্ধে। জ্যোৎস্নারাত্রে নৌকাতে দিব্যি এলুম অভিলাষের সঙ্গে গল্প করতে করতে।

১৯শে মার্চ, ১৯৪৫। ৫ই চৈত্র, ১৩৫১। সোমবার।

ঠাকমাদের বেলতলাটা আজ খুঁজে এলুম সকালবেলা উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে গিয়ে। স্নান করে স্কুলে যাই। রোদ আজ খুব। চিঠিপত্তর আজ নেই। বিকেলে বাড়ি গিয়ে ঘেঁটুফুলের বনে খুকুদের চারাবাগানে বেড়াতে গিয়ে এমন সুন্দর লাগে। বাবা যখন অক্ষম হয়, তখন যেমন ছেলেদের জন্যে খেলাঘরের পুতুল করে দেয়, ভগবান যেন অক্ষম বাবা, সামান্য ঘেঁটুফুল করে রেখেচেন—একা থাকেন, কেউ তিরস্কার করলে কেঁদে ফেলেন। অনন্ত তিনি, সবই পারেন তো ?স্নেহ হয় তাঁর জন্যে। আমার বাবাকে দিয়ে আমি জানি কিনা !

বেলতলাটা দেখলুম ফিরবার পথে। তখন সন্ধ্যার দেরি নেই। একটু পরে জ্যোৎস্না উঠল। দিব্যি জ্যোৎস্না। ইন্দুর বাড়ি যাবার আগে শ্যামাচরণদার বাড়ি গিয়ে গল্প করি ও তামাক খাই। ইন্দুদের বাড়ি গিয়ে দেখি ফণিকাকা, কালীপদ মৎপুরের বনে—গল্প করলুম ! পাঁচীর সঙ্গে পশ্চিম ভ্রমণের গল্প করি। আজ কেনা মোহন ?বাড়ি গোনাযাত্রা হবে—তাতে যাবার ইচ্ছে আছে। রাত্রে বাড়ি ফিরে যাই। তখন রাত ন'টা।

২০শে মার্চ, ১৯৪৫। ৬ই চৈত্র, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

সকালে বেলতলা দেখে এলুম ঠাকমার। কোথায় বেল ?নেই। কল্যাণীকে নিয়ে নাইতে গেলুম সকালে। আমি ছিরেপুকুরের ধারে ঘেঁটুবনে বেড়াতে গিয়েছি, ও খুকুদের চারাবাগান থেকে ডাকচে—মানকু, কোথায় গেলে মানকু, এদিকে এসো। স্কুল। এসে একটু শুই ও লিখি। ঘেঁটুফুলের বনে বেলা গেলে ভগবানের কথা মনে এল। কি সুন্দর গন্ধ এখনো। খোচো একটা বড় মাছ নিয়ে যাচ্চে—মরা কাৎলা। ইন্দুদের বাড়ি জ্যোৎস্নারাত্রে কতক্ষণ বসে গল্প করি।

২১শে মার্চ, ১৯৪৫। ৭ই চৈত্র, ১৩৫১। বুধবার।

সকালে লিখি। স্নান করবার আগে ঘেঁটুফুলে ভর্তি ছিরেপুকুরের পাড়ে গিয়ে বসি। একটা ঘেঁটুফুলের গাছকে আলিঙ্গন করে যেন ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করা গেল। চোখে জল আসে যেন। সবই তিনি। স্কুল থেকে সুন্দরপুরে যাওয়ার জন্যে গাড়ি আসবার কথা। গাড়ি এল না। বাড়ি এলুম। পথে ইন্দুর সঙ্গে দেখা। সে সুন্দরপুরে যাবে বলে দুপুরে বাসায় চলেচে। বাড়ি এসে শুয়ে থাকি। শরীর বড় ক্লান্ত কেন কি জানি ! সন্ধ্যার আগে ঘেঁটুফুলের বনে বেড়িয়ে এলুম। ইন্দুদের বাড়ি জ্যোৎস্নারাত্রে বসে থাকি। বাড়ি এসে খেয়ে শুয়েচি। ঘুমভাঙার ?মাঝে মাঝে মুসলমান পাড়ায় গোনাযাত্রার শব্দ শোনা যাচ্চে। অনেকরাত্রে গোনাযাত্রা ভাঙল। শান্তি এল।

২৪শে মার্চ, ১৯৪৫। ১০ই চৈত্র, ১৩৫১। শনিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

ভোররাত্রে উঠে হাতমুখ ধুয়ে রওনা। কল্যাণী বলে—গা ছুঁয়ে বলো, কল্যাণী, আসবো আসবো। বনগাঁ হয়ে, ট্রেন থেকে নেমেই সজনী দাসের বাড়ি। সেখানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনীদা প্রভৃতি, P.C.L. ঘোর আড্ডা। মনমোহন এল রেডিওর। Cross word-এর ধুম। সজনীর বাড়ি খেয়ে নলিনীদা ও আমি ৯বি বিবেকানন্দ রোডে মেঘমল্লারের ব্যবস্থা করতে। সেখান থেকে গিরিন সোমের বাড়ি। অপরাজিতর তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে। চারটার সময় দাঁড়িয়ে রইলুম কলেজ স্কোয়ারে, মিত্র এল, নিয়ে গেল বালিগঞ্জে। রিহার্সাল হল। ওখান থেকে কানুমামার বাড়ি। চা খেয়ে ট্রামে শক্তিপদ রাজগুরুর মেস। সেখান থেকে বেরুচ্চি, একজন কে বলচে ও বিভূতিবাবু ?দেখি খেলাৎ স্কুলের সেই আধ আধ কথাওয়ালা ছাত্রটি। তার সঙ্গে গল্প করি ওদের বাড়ি বসে। সেখান থেকে হেঁটে আসচি, জ্যোৎস্না রাত্রি ?পার্কে বসলুম। শক্তিপদ ও আমি গল্প করচি, আমার অধ্যাপক অশ্বিনীবাবু যাচ্চেন দেখে ডাকলুম। এলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসা। তাঁর ছোট মেয়েটি আলাপ করলে—বল্লে, আবার আসবেন। সেখান থেকে বুদ্ধদেবের বাড়ি। নলিনীদা এলেন—ছাদে বসে আড্ডা—তবে সমস্ত রাত ঘুম হল না গল্পে গল্পে। সংযমের সম্বন্ধে উপদেশ।

২৫শে মার্চ, ১৯৪৫। ১১ই চৈত্র, ১৩৫১। রবিবার। কলিকাতা—বারাকপুর

ভোরে উঠে চা খেয়ে সুরেশের বাড়ি। General Printers-এর পথে সমরেশকুমার আমার ছাত্র তার সঙ্গে দেখা। সে আই এ পড়চে। General Printers-এ বহুক্ষণ বসে। সেখান থেকে অমিয় মুখার্জি, M.C. গজেন। বেড়াবার ঠিক হল। ৩টার ট্রেন ধরে বনগাঁ। মন্মথদার বাড়ি চা খাই, যতীনদার বাড়ি গল্প করি। মিতের সঙ্গে দেখা করি। সেখান থেকে ডাকবাংলোয় বসে আড্ডা হল। রমেশবাবু, ডাক্তার, দুটি মেয়ে ও ডাক্তারের স্ত্রী সবাই। মোটরে বারাকপুর পৌঁছে দিয়ে গেল। জ্যোৎস্না অদ্ভুত। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি জ্যোৎস্নায় বসে। রাত্রে ভীষণ ঘুমুই।

২৬শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৩ই চৈত্র, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে ডায়েরি লিখি। স্নান সেরে স্কুল। আমবাগান ঘুরে বাড়ি এসেচি। অনেক স্কুলের ছেলে এল। গল্প করি ওদের সঙ্গে। নির্জন বিকালে বেড়াতে যাই মাঠে। ইন্দুর বাড়ি জ্যোৎস্নায় বসে গল্প।

২৭শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৩ই চৈত্র, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

সকালে লিখি না, পড়ি 'হিমালয়' জলধর সেনের। কাঠুরে জন আসাতে কাঠ কাঠ করে শ্যামাচরণের বাগানে ছুটে যেতে হল। কাঠ ঠিক করে এসে নাইবার সময় পেলাম না। এক ঘটি জল মাথায় দিয়েই স্কুল। হেডমাস্টার বল্লেন,

কৃষ্টনগরে যেতে হবে আপনাকে। গেলুম না। বাড়ি এসে চা খেয়ে কল্যাণী দেখি সেন্ট মেখেচে। আমি বলি, কিসের গন্ধ ?ও বলে, মানকু, গায়ে হলুদের সেই সেন্টটা। দেখি ?ও দেখালে। বল্লে, তুমি আসবার একটু আগে মেখেচি। রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে আমায় চুপি চুপি বল্লে—মানকু, তুমি আমায় ভালোবাসো ?এই সময় ছেলেরা এসে পড়ল। আমি সুন্দর বৈকালে স্নান করতে গেলুম। আজ পূর্ণিমা। ফিরবার পথে দেখি বাঁশবনের আড়ালে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। ইন্দুদের বাড়ি অনেকরাত পর্যন্ত গল্প। ফণিকাকা, আমরা সবাই। ইন্দু এল বিকেলে গল্প করতে।

মহাদেব রায় ও মনোজ বসুর পত্র এল। মহাদেব লিখেচে Easter-এর ছুটিতে সে খড়্গপুরে থাকবে না। মনোজ লিখেচে, বই চাই।

২৮শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৪ই চৈত্র, ১৩৫১। বুধবার।

আজ স্কুলে গেলুম স্নান করে। স্কুলে ম্যাজিক ও কমিক হল। শুনে আসতে দেরি হয়ে গেল। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গল্প [।]

২৯শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৫ই চৈত্র, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে লিখি। স্কুল। ছুটি হবে কোথায় যাবো, কোথায় যাবো ভাবচি। গেলুম না। স্নান করে এলুম বিকেলে। হাট করে। ইন্দুর বাড়ি গল্প।

৩০শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৬ই চৈত্র, ১৩৫১। শুক্রবার।

ছুটির দিনটা। ৫০টি টাকার কোনো হদিস পেলুম না। সেদিন যা কলকাতা থেকে এনেছিলুম। বসে বসে 'আরণ্যক' ছেলেদের জন্যে কাটিকুটি। তারপর গিরিনদার বাড়ি বসে গল্প। স্নান করে এসে খেয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করি। ঘুম হল না। ছিরেপুকুরের ওধারে গেলুম বেড়াতে, ঘেঁটুফুলের বন এখনো বড় সুন্দর। ফিরে এসে দেখি Captain চৌধুরী এবং মেয়েরা এসেচে। ওদের সঙ্গে মাঝের গ্রামে অমূল্যবাবুর বাড়ি ও মহীতোষদের বাড়ি। পাঁচী, জগো, সুনীত এল—বেশ চাঁদ উঠল। বাড়ি এসে ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি। অনেকরাত্রে এসে খেলুম।

৩১শে মার্চ, ১৯৪৫। ১৭ই চৈত্র, ১৩৫১। শনিবার।

সকালে ছুটির দিন। লিখি। ইন্দু এল। তার সঙ্গে গল্প। স্নান করি। খেয়ে ঘুমুই। উঠে লিখি 'অথৈ জল' [।] ওদের ঘাটশিলা যাবার কথা হয়। বিকেলে সেই শিমুলতলায়। ইন্দুর বাড়ি জেলি, ইন্দু [।]

১লা এপ্রিল, ১৯৪৫। ১৮ই চৈত্র, ১৩৫১। রবিবার।

ছুটির দিন। ফণিকাকা ও ইন্দু এল সকালবেলা। বাঁশের টাকা নিতে। স্নান করে এসে ঘুমুই। পরামর্শ করি কল্যাণী ঘাটশিলায় যাবে কিনা ওদের সঙ্গে। তারপর ঘুমুই। ঘুমিয়ে উঠে দেখি মিতেদের মোটর এল। ওদের সঙ্গে রানাঘাট। কি বিশ্রি [বিশ্রী]। সন্ধ্যার পরে চলে আসি। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি জেলি, ফণিকাকা প্রভৃতি রাত ১১টা পর্যন্ত। উমা ও শান্তর যাওয়া হল না ঘাটশিলা।

২রা এপ্রিল, ১৯৪৫। ১৯শে চৈত্র, ১৩৫১। সোমবার।

ছুটির দিন। সকালে নতুন উপন্যাস Sketch করি। ফণিকাকার বাড়ি গিয়ে বসি। স্নান করে এলুম। ঘুমুই। কল্যাণীরা গেল বনগ্রাম। আমি একা স্নান করে এলুম। রন্ধন করি হাবু ও আমি। ভগবানকে মনে হল বড় অবহেলিত। বিজয় চাটুয্যে লিখেচে ভগবানকে টেনে মানবের দরকার নেই সব কাজে। যাঁর হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্চি, যিনি সর্বদা চোখের সামনে ফুল ফুটিয়ে রেখেচেন, তাঁর ঋণ আমরা স্বীকার করি না—এখনো পর্যন্ত (দশ লক্ষ বৎসর) তাঁর অস্তিত্বই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হল না—তো আমি দেবযান লিখে recognition খুঁজচি। একটা ঘেঁটুফুলের গাছে ঘেঁটুফুল দেখে বড় আনন্দ হল—মনে হল ভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাব। বেঁধে রেখে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে ভগবত্তত্ব [ভগবত্তত্ত্ব] বিষয়ে কথা হয়। ফণিকাকা ইন্দু প্রভৃতি উপস্থিত।

৩রা এপ্রিল, ১৯৪৫। ২০শে চৈত্র, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

সকালে ন'দি এল। তার সঙ্গে গল্প করি। ন'টা বাজে। আজ স্কুল খুলবে। কল্যাণী ও আমি ঘাটে গিয়ে নেয়ে এলুম আমাদের পাড়ার ঘাটে। স্কুল গেলুম অনেকদিন পরে। বাড়ি এসে লিখবো, ছেলেরা এসে ভিড় করলে। কল্যাণী গেল

মীনাদের বাড়ি। আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমাদের বাড়ির ঠিক পিছনে বাঁশঝাড়ে সন্ধ্যায় পাখির ডাক শুনতে পেলুম। শ্যামাচরণদের বাড়ি ও ইন্দুদের বাড়ি।অনেকরাত পর্যন্ত বুড়ি পিসিমার সঙ্গে গল্প করি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৫। ২১শে চৈত্র, ১৩৫১। বুধবার।

সকালে ছিরেপুকুরের ওপারের বাঁশবনে কেমন সুন্দর পক্ষীকাকলী। স্কুল। বাড়ি এসে লিখে সুন্দর বিকেলে কল্যাণী ও আমি নাইতে গেলুম। তারপর বড় সকালে সকালে ইন্দুদের বাড়ি যাই। ফিরে এলুম রাত ১২টা। অনেকরাত্রে আলো দেখা যাচ্ছে। কল্যাণী ও আমি আলো ধরে ছিরেপুকুরে গিয়ে দেখি বনপোড়া দিয়েচে। জ্বলচে বাঁশবাগান।

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫। ২২শে চৈত্র, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

লিখি। খুড়ো ও ইন্দু রায় এসে বললো বড় মাছ দিয়ে গেল গুড়ে জেলে। ভাগ করে নিলাম আমরা। স্কুল। হাট করে বাড়িতে এলুম। হাটে পটল আজ ॥০ আনা সের। একটু সস্তা হয়েচে বলতে হবে। এসে খেলুম মাছের কচুরি। কল্যাণী ভেজেচে। চা আর মাছের কচুরি। খেয়ে কল্যাণী ও আমি নদীর ঘাটে গা ধুয়ে এলুম। শ্যামল ও নিমাই চালকী গেল সত্যনারাণের সিন্নির দুধ নিয়ে। ইন্দুর বাড়ি গল্প করে ফিরলুম। চড়ক সম্বন্ধে কথা হল।

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৫। ২৩শে চৈত্র, ১৩৫১। শুক্রবার

সকালে লিখি। কতকাল পরে কাগজের বোঝা ঘুচেছে এবার। স্নান করে আসি কল্যাণীর সঙ্গে। আবেদালি ঘরামি কাজ করচে—ও হবু ঘরামির ছেলে। ছেলেবেলায় হবু কত ঘর ছেয়ে দিয়ে গিয়েচে আমাদের। ওরা আজই ঘর ছেয়ে শেষ করলে। স্কুল থেকে এসে দেখি ঘর ছাওয়া শেষ হয়েছে। গা ধুতে কল্যাণী ও আমি। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি—বাড়ির সবাই গোপালনগর গেল যাত্রা শুনতে স্কুলে। আমার ঘুম ভালো হল না গরমে। অনেক রাত্রে ৪।।0 টাতে সব এল। তখন চাঁদ উঠেচে। "সকলের চেয়ে বেশি পাপ হচ্চে নিজেকে দুর্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। উপলব্ধি কর যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা সূর্য, চন্দ্র, তারা এমনি কি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের উপরে। শিক্ষা দাও যে মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে এ স্বীকার করো না, যা নেই তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি করো না। সদর্পে বল আমি প্রভু। আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজের নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙতে পারি। কোনো ধর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে।"—বিবেকানন্দ।

৯ই এপ্রিল, ১৯৪৫। ২৬শে চৈত্র, ১৩৫১। সোমবার।

ছুটির দিন। কারণ আজ ভোট দেওয়া হবে। সকালে উঠে লিখি অনেক বেলা পর্যন্ত। রবীন কলকাতার ছাত্রটি এল। তার সঙ্গে গল্প করি। ওখান থেকে নাইতে যাই ওকে নিয়ে অনেক বেলায়। ৪টার ট্রেন নাকি কলকাতায় বন্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি। যাওয়া হল না। লতু আমাদের সঙ্গে যাবে বলে সন্ধ্যার সময়েই এল। মনিঅর্ডার পাঠিয়েচে নরনারায়ণ স্কুল। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প। ভোট দিতে গেলুম না। ন'দিদির সঙ্গে গল্প করি ফিরে এসে।

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫। ২৭শে চৈত্র, ১৩৫১। মঙ্গলবার।

ভোররাত্রে উঠে হেঁটে স্টেশন। কল্যাণী, উমা, লতু, রবীন ও আমি। সকালে মল্ল যাচ্চে, বনগাঁ স্টেশনে দুজনে গল্প করি। স্কুলমাস্টারের জীবন যে কিছু নয় এই কথা বলে একটি ছাত্রকে বল্লে—সিঙাড়া আনো। সে গরম সিঙাড়া আনলে। আমি বললাম—আমি খাবো না। কলকাতায় গিয়ে ?মায়াদি ও কানু মামা। ওদের পৌঁছে দিয়ে স্নানাহার করে আমি সুরেশ দাসের ওখানে। 'আরণ্যক' দিতে এলুম। সে বল্লে চায়ের নিমন্ত্রণ করবো, গাড়ি পাঠিয়ে দেবোকাল। ওখান থেকে মিত্র ও ঘোষের দোকানে M.C. সরকারের দোকানে। প্রবোধ এল, গল্পগুজব খুব। ওখান থেকে বালিগঞ্জে এসে দেখি গাড়ি পাঠায়নি। তারপর রবীন এসে ?এখুনি গাড়ি নিয়ে ওরা আসচে। এল তখুনি, সবাই মিলে গেলুম। কালিকা থিয়েটার্সে বেশ লোক হয়েচে। হাউসফুল। 'মেঘমল্লার' নৃত্যাভিনয় হল। ঝমঝম বৃষ্টি। মোটরে অনেক রাত্রে ফিরি। কানুমামার সঙ্গে গল্প। মাংস দিয়ে ভাত খাই।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪৫। ২৮শে চৈত্র, ১৩৫১। বুধবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকাল আটটায় ঢাকুরিয়া এলুম বাসে। চা খাই সুমথদের বাড়ি। উমাকে দেখানো হল। সুমথবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সবাই ওর বাপের বাড়ি। খুব খাওয়াদাওয়া। প্রবোধ এল। আড্ডা। বাসে কলেজ স্ট্রীটের দোকানে এসে সরবৎ খেয়ে ট্রামে শেয়ালদ'। তিনটের ট্রেনে বনগ্রাম। ঘোড়ার গাড়ি করে যোগেন বিশ্বাসের বাসায় এসে সবাই জল খেলে। পাড়াসুদ্ধ মেয়ে

ভেঙে এল দেখতে। শংকরী, বীণা, আদিত্যের বাড়ির সব। বাড়ি আসাতে নামলাম পাকা রাস্তায়। গজন, মধু, কালো, পাঁচু সবাই বসে আছে—বল্লে চড়কের ঢাক আসেনি। বাড়িতে এসে কল্যাণী ও আমি স্নান করতে গেলুম। কি শান্ত শ্যামশোভা, মাটির ও বাঁশপাতার সুগন্ধ। যখনই কলকাতা থেকে আসি—তখনই এর সুগন্ধে মন যেন জুড়িয়ে যায়। নদীজল কি স্নিগ্ধ। বাড়ি ফিরে রায়বাড়ি চড়কের শয়াল দেখতে যাই। বাল্যকালে দেখতুম শয়াল, কতকাল আগের কথা—আর কাল থিয়াটারে আমার বই দেখেআজই এইমাত্র কলকাতা থেকে এসেচি, আবার জয়নগর মজিলপুর যেতে হচ্ছে রবিবারে। চড়কের ঢাক বাজচে। শয়াল শেষ হয়ে ওরা কাঁটা ভাঙচে বাল্যের মতো চড়কতলায় সেই খেজুর গাছে। কতকাল আগের মতো আজও দেখতে ইচ্ছে হয়। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি ও ন'দির সঙ্গে।

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫।২৯শে চৈত্র, ১৩৫১। বৃহস্পতিবার।

সকালে লিখি ও পড়ি। ছিরেপুকুরের ধারটি কেমন সুন্দর। হাওয়াও খুব। স্কুল। ৪ দিনের ছুটি হল। চড়কপুজো ইত্যাদি। হাট করে আসতে দেরি হয়ে গেল ?মা হাটে আসে নি—বেল, পেঁপে, কলা ইত্যাদি কিনে শুঁটোর দোকানে রাখি। খগেন মামা এসেচেন কাছারিতে—তাঁর সঙ্গে আলাপ করি পুরোনো দিনের। সেই লোকটা বিলেত থেকে এসে বলেছিল বেগুনভাজা লাগে গরুর মুখের মধ্যেকার মাংসের মতো—তার কথা। বেলা গেলে হাট থেকে ফিরে চা খাই—সন্ধ্যা হয়ে গেল। আজ নীলের উপোস—অনেকদিন পরে, অর্থাৎ—জীবনে এই প্রথম নিজের বাড়িতে বসে চড়ক ও হাজরা ঠাকুরের ভোগ দিতে যাওয়া লক্ষ্য করচি। বাল্যকালে দেখতুম। তারপরে এই দিনটি সর্বপ্রথম আজ নিজের বাড়িতে নিজের গ্রামে যাপন করচি। নীলের উপোস করেচে কল্যাণী। ইন্দুর বাড়ি থেকে এসে পরোটা ও হালুয়া খেয়ে শুয়ে পড়ি। রেডিও বক্তৃতার আবাহন এসেচে আজ।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫। ১৬ বৈশাখ, ১৩৫২। রবিবার। বারাকপুর—বনগ্রাম

সকালে উঠে লিখচি এমন সময় একজন লোক এসে হাজির। শিবদাস চক্রবর্তী, যশোরের সেই ছেলে, তার সঙ্গে গল্প করি। স্কুলের ছেলেরা এসে হাজির। তার পর খেয়েদেয়ে আমি ও শিবদাসবাবু বনগ্রামে গেলুম। দিনটি ঠাণ্ডা। সাঁকোর ওপর বসে ওকে লিখে দিলুম আশীর্বাণী। পথে যেতে বিজয় (সাতুকাকার ভাগনে) ডাকচে—ও বিভূতিদা ?বলি—কে ?আমি বিজয়। চলল ও আমার সঙ্গে। রমেশবাবুর বাসায় চা খেয়ে স্কুলে এলুম দুজনে। সেখানে সবাই আমায় দেখতে চায়। যশোর জেলা শিক্ষক সমিতির অধিবেশন। সুধীরদা, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার। ডাঃ চৌধুরী, বিশ্বনাথ আমায় ডেকে পাশে বসালেন। নমস্কার করলেন। ওঁরা চলে গেলে নতুন মাস্টার আমাদের দই সন্দেশ খাওয়ালে—গল্প করলে। ওর ছেলে অকস্মাৎ কিভাবে মারা গিয়েছিল। না সে বাঁচবে। (পতিত) prayer. লিচুতলায় যাবার আগে বৃষ্টি ও ঝড়। প্রফুল্ল ঘোষের আটচালায় হিন্দুসভার মিটিং। স্বামী নিখিলানন্দ দেবমন্দির করতে এসেচেন। মিতে, দেবেন,?, মন্মথদা, সতীশকাকা। বিষ্ণু মণ্ডল বর্ণনা করতে লাগলেন। তাকে (?)কেমন করে মেরে দিল; বিড়ি খাই ও গল্প করি তার সঙ্গে, মিতের সঙ্গে। লিচুতলায় ঘোর আড্ডা। জার্মানির সম্বন্ধে বলচি সতীশকাকা বল্লেন—এও একজন doctor—তবে এখানে কেউ চিনলে না। ওখান থেকে বেরিয়ে বাজার থেকে রসগোল্লা কিনে বীণার ভাইয়ের হাতে দিয়ে আসবো—বিশ্বনাথ ও কালোর সঙ্গে রাস্তায় বসে বসেই আলাপ। ওখান থেকে সন্দেশ নিয়ে আসচি, ধীরেন বলে—ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবেন না। বল্লুম—সময় নেই। আবার এসে লিচুতলায় আড্ডা [—] সেখান থেকে ফিরচি শচীন ডাক দিলে—'দেবযান' নিয়ে নাড়াচাড়া [।]

৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫। ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে উঠে জ্যোৎস্না উঠেচে—তখন হাঁটি। হেঁটে স্কুলে। স্কুল থেকে বাড়ি এসে নদীতে নাইতে যাই কল্যাণীকে নিয়ে। ঘুমুই। উঠে লিখি সন্ধ্যা পর্যন্ত। আবার নদী থেকে স্নান করে আসি। সন্ধ্যাবেলা ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

১লা মে, ১৯৪৫। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে স্কুলে। স্কুল থেকে এসে নেয়ে এলুম একা। খেয়ে উঠে ঘুমিয়ে লিখতেবসেচি—দুজন কলেজের ছাত্র এসে হাজির। তারা খুলনা থেকে এসেচে। তাদের নিয়ে গল্প করচি—এমন সময় কল্যাণী নিমকি করে নিয়ে এল। আমি গেলুম ওদের নিয়ে শাঁখারিপুর, ছিরেপুকুর—তারপর বাঁশতলার ঘাট। সেখানে এল মিতে, রমেশবাবু, কাপ্তেন চৌধুরী। ওদের নিয়ে বাড়ি এসে বসি। ওরা চা খেল। চলে গেল ওরা। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি। ফণিকাকা এল। গল্প করলে। বাড়ি এসে অথৈ জল লিখি। অনেক রাত্রে শুই। টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতি রেখে গেল আমাদের বাড়ি।

২রা মে, ১৯৪৫ ১৯শে বৈশাখ, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে স্কুল। সেখান থেকে চলে এলুম মিস্ত্রি এসেচে টিউবওয়েলের। স্নান করতে গেলাম। লোকে লোকারণ্য বাড়িতে। টিউবওয়েল বসানো দেখতে এসেচে সবাই। এক জায়গায় বসল না। অন্য এক জায়গায় বসানোর ব্যবস্থা করে সবাই নাইতে গেল। আমি বসে লিখি। স্নান করে আসি সন্ধ্যার আগে। তারপর অমৃতকাকাদের বাড়ি ও কিশোরকাকাদের বাড়ি—কিশোর-কাকা গান করলেন 'আশা নদীর বালুর চরে বাঁধলি মাটির ঘর'। এখনো বেশ গলা। মনু খুড়োর বাড়িতে বসে হরিপদদা প্রভৃতি গল্প করি। ন'দি প্রভৃতি রোয়াকে শুয়ে রয়েচে। এলুম সেখানে।

৩রা মে, ১৯৪৫। ২০শে বৈশাখ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

আজও সকালে স্কুল। এসে নাইতে গেলুম কল্যাণী ও আমি। কল খুঁড়ছে মিস্ত্রীরা। ওরা রান্না করে খেলে। বীরেশ্বর এল। সে অনেকক্ষণ গল্প করলে। তারপর এল বৃষ্টি—ঝড়। এখন ওরা চলে গিয়েচে। আমি কোথাও যাইনি। বাড়িতেই আছি। লিখি। সকাল সকাল খাই।

কল হয়ে গিয়েছে। তা থেকে জল তুলচে উমা ও শান্ত। জলের কষ্ট দূর হয়েচে।

৪ঠা মে, ১৯৪৫। ২১শে বৈশাখ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে উঠে স্কুল। স্কুল থেকে খবরের কাগজ দেখে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। এসে নদী থেকে কল্যাণী ও আমি নেয়ে এলুম। খেয়ে ঘুমুই। উঠে লিখি আজও, গল্প শেষ করতে হবে। সন্ধ্যার পূর্বে কল্যাণী ও আমি গা ধুয়ে আসি। কল্যাণী বল্লে—ঝি-চাকর না হোলে আর চলেনা—এই বলে বকুনি খেলে।

ন'দির কাছে এসে গল্প করি। Julian Huxley লিখচে God is the universe [—] কথাটা বড়ই ঠিক বলে মনে হল।

৫ই মে, ১৯৪৫। ২২শে বৈশাখ, ১৩৫২। শনিবার।

স্কুল। সকাল সকাল ফিরি। একটা গুড়ের নাগরি নিয়ে এল শ্যামল। উমার আবার জ্বর হয়েচে। কল্যাণী অনেক বেলায় আমার সঙ্গে নাইতে গেল। খেয়েদেয়ে ঘুমুই। জগো আর ? ?এল দুপুরবেলা। আমি গল্প ফাঁদি। বেলা পড়লে একা স্নান করে আসি। পাঁচী এল। বসে গল্প করি ইন্দুর বাড়ি।

৬ই মে, ১৯৪৫। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে উঠে লিখতে বসি। বেড়াতে যাই। তিনুদের কলাবাগানে। কলা বোষ্টম এসে বল্লে, ফণি চক্কত্তির টাকার মীমাংসা করে দেবেন চলুন। গেলুম। সব ঠিক হল। এসে হাঁড়ি মুসুরির ডাল নিয়ে এলুম ইন্দুদের বাড়ি থেকে। কল্যাণী ও আমি অনেক বেলায় নাইতে গেলুম। খেয়ে ঘুমুই। লিখি। মহাদেব রায়ের ও সুশীল বলে সেই ভক্তটির চিঠি এল। সন্ধ্যাবেলা নাইতে যাই কল্যাণী ও আমি। কলসি করে ঘাটের জল আনি। কারণ মুসুরির ডাল ভাতে দেওয়া হবে। ইন্দুদের বাড়ি। গল্প করি ও শ্যামাচরণদাদের বাড়ি। পাঁচী আজ চলে গেল। রাত পর্যন্ত গল্প রোয়াকে ন'দি, পিসিমা।

৯ই মে, ১৯৪৫। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫২। বুধবার। বারাকপুর—কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে স্নান করে এসে স্কুল। স্কুল থেকে স্টেশন। পাল্লার নিরঞ্জনের বাবা যাচ্চে বনগাঁ। বসল এসে আমার কাছে। সবাই বলে ভিকট্রি ডে আজ, ছুটি সব। গুরুপদ সান্যাল ও আমি একসঙ্গে গেলুম। প্রথমে মনোজ বসুর ওখানে গিয়ে গল্প দিই, টাকা নিই। পরে এম. সি. এবং মিত্র ও ঘোষ। কৃষ্ণদয়াল বসু সেখানে। বরেন্দ্র কাত্যায়নী ও ডি এম। মেঘমল্লারের ২য় সংস্করণ আজ বেরুল। এবং বিচিত্র জগতের ২য় সংস্করণের কনট্রাক্ট হল। বৃন্দাবন অধিকারীর সঙ্গে দেখা যখন ট্রামে যাচ্ছি। ৫-৪০এ চলে এলুম বনগ্রামে। রমেশবাবু হেডমাস্টার ও মিতের ভাই অনিলের সঙ্গে দেখা। ট্রেন খুব ধীরে ধীরে এল। মাদলার পুলের কাছে এসে মনে হল এখানেই ট্রেন বন্ধ হল বুঝি। ঝড় ও বৃষ্টি এল। বৃন্দাবনের গরুর গাড়ি করে চলে এলুম ওদের বাড়ি। ওখান থেকে ওদের মহিন্দার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

১০ই মে, ১৯৪৫। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে স্কুল, গিয়েই ছুটি। ঝড়বৃষ্টি এল। বিজয়-দিনের ছুটি। কাদের বিজয়দিবস ?তিনটি যুদ্ধমান পাশ্চাত্ত্য শক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—তাতে আমাদের কি ?এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়। ভারতবাসী যারা এ যুদ্ধে লড়েছিল—ক্রীতদাস যেমন প্রভুর হয়ে লড়ে, তেমনি লড়েছিল পেটের দায়ে। এ যুদ্ধ আমাদের নয়। ইলিসমাছ কিনে বাড়ি চলে এলুম। বেশ ঠাণ্ডা—শীত বলা যায় তাকে। স্নান করে এসে খেয়ে ঠেসে ঘুম দিই। একেবারে ৫টা। বিকেলে অনেকদিন পরে গেলুম সেই

হ্রদে—সোঁদালি ফুল ফুটেছে—অনেক-দিন সেখানে যাইনি—ভগবানের নাম করি সৌন্দর্য দেখে—তাঁর সঙ্গে যার প্রেমের সম্পর্ক সে আলাদা। তিনি কৃপা করেন অনেক মূর্খ জীবের প্রতি—যে জীব যত মূর্খ, তিনি তত অনুকম্পাশীল তাদের প্রতি। এ ধ্রুব সত্য—অতি মূঢ়, মূর্খ, অজ্ঞান জীবের পুতুল খেলাকে তিনি পিটি-র চক্ষে দেখেন—কিন্তু জ্ঞানীকে তিনি ভালোবাসেন, প্রেম হয় তার সঙ্গেই। চলে এলুম। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে ক্ষেত্র কলুর সাজিতলায় বসে মদ খাওয়ার গল্প বড়ো মজা লাগে শুনতে। গান করে—'বামা করে কামিনী' ক্ষেত্র কলুর মজার গল্প। ফকিরচাঁদকে দেখতে গেলুম, টাইফয়েড হয়েছে। বাড়ি আসি, লিখি। রাত্রে ঘুম হয় না ভালো মশার কামড়ে।

১১ই মে, ১৯৪৫। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে উঠে স্কুল। স্কুল থেকে এলুম বড় শ্রান্ত হয়ে। এসে কল্যাণীর সঙ্গে স্নান করে যেন ধড়ে প্রাণ এল। বাবাঃ কি গরম ! খেয়ে যেমন শুয়েচি—অমনি শরীরমন ভেঙ্গে পড়তে চাইল। অন্যদিন ঘুমুই, আজ আর ঘুম এল না। তারপর ঘুম এল। ঘুম ভেঙ্গে উঠে একবার বরোজখোলা ডোবার ধারে গিয়ে বসি, বাঁশবনের কি সৌন্দর্য ! মনু বলে একটি মেয়ে চিঠি লিখেচে বালি থেকে।

বিকেলে ফকিরচাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখে এলুম। সেখান থেকে এসে একা নাইতে গেলুম নদীতে। ভীষণ মেঘ ও ঝড় এল—বেশ লাগে। ন'দি এসে গল্প করতে লাগল। ঝড় মাথায় ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

১২ই মে, ১৯৪৫। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে স্কুল। ভোরে উঠে গেলুম। মাইনে নিতে বিলম্ব হয়ে গেল। হরিপদদা বললে যাবো—কিন্তু শেষ রাতে। বাড়ি এলুম—ভীষণ গরম। কল্যাণীর সঙ্গে নাইতে গেলুম নদীতে—ফিরে এলুম বেলা ১।। টায়। উমার জ্বর। আমি বসে লিখচি। ফকিরচাঁদের বাড়ি সুরেন এল, তাকে নিয়ে এলুম বাড়িতে। চা খেয়ে চলে গেল—আমি গেলুম ইন্দুর বাড়িতে। সে আবার গেল রাত ন'টার ট্রেনে গোপালকে নিয়ে আসতে। আমি খেয়ে শুই। ভীষণ গরম।

১৩ই মে, ১৯৪৫। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫২। রবিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

ভোরে উঠে স্নান করে ট্রেন ধরে কলিকাতা। মণি বোসের বাড়ি গল্প করি। ওর স্ত্রী নিমকী ও সিঙ্গাড়া খাওয়ালে, চা হল। ওখানে শুনলাম 'মীনকেতুর কৌতুক'-এর সংস্করণ শেষ হয়েছে। আর একটা সংস্করণের জন্য বলতে হবে। কানুমামার বাড়ি গিয়ে গল্প করি, চা খাই, ভাত খাই। সুবর্ণ দেবী ও আমরা একত্রে উত্তরপাড়া। রমেন অভ্যর্থনা করলে। অপূর্ব চন্দ্র, অমিয় চক্রবর্তী, সুকুমার মুখুজ্যে—সবাই উপস্থিত। চা-পানের পর ফটো তোলা হল। সভা হল জ্ঞানমন্দিরে। সভার পরে আবার চা-পান। বাণী রায় বললে, আমার সঙ্গে আসুন, আমার গাড়িতে নিয়ে যাবো। সুকুমারবাবুর গাড়িতে একত্র এলুম। আজ প্রথম দেখি পথেঘাটে আলো। কলকাতা শহরে পাঁচ বছর পরে এ যেন অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। হাওড়া পুল পার হবার সময় পুরনো আলোকোজ্জ্বল কলকাতার চেহারা আবার দেখলুম। আজ ভিকট্রি ডে ওদের। ক্লাইভ স্ট্রীটে ও লালবাজারে বড় বড় বাড়িতে খুব নীল লাল আলো দিয়েছে। নীরদবাবুর বাড়িতে এসে রাত্রি থাকি।

১৪ই মে, ১৯৪৫। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৫২। সোমবার।

ভোরে উঠে নীরদবাবুর বাড়ি থেকে স্নান সেরে বার হয়ে নরেন দেবের ও রাধারানীর বাড়ি। রাধারানী বৌদি এসে আলাপ করলেন। অনেকদিন পরে দেখা। বাণী রায়ের বাড়ি এসে গল্প করে লেকের ধার দিয়ে ভীষণ রোদে গৌরীদের বাড়ি। সেখানে গজেন, সুমথ ও গৌরী উপস্থিত। খেয়ে নিয়ে দোকান। এম সি 'চাঁদের পাহাড়' ও 'মরণের ডঙ্কা বাজে'র টাকা দেবে বললে। ট্রেন, বনগাঁ-পথে মেঘ করল খুব। বেশ লাগল আসতে। বনগাঁ এসে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপালকে বললুম, তুই যতীন ডাক্তারের বাড়ি থাক। ললিতবাবুর ছেলে চা খাওয়ালে। সেখান থেকে বন্ধুর বাড়ি। ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি। বৃষ্টির পর যতীনদার ওখানে। মন্মথদা ও আমি বন্ধুর ওখানে হালখাতা খেয়ে হেঁটে অন্ধকার রাত ন'টায় বাড়ি। ন'দি, পিসিমা বাইরে শুলো। আমি গিয়ে দেখি কল্যাণী ঘরে আমার অপেক্ষায়। আমি বিশেষ কিছু খাবো না। ন'দির সঙ্গে গল্প করে শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি আবার।

১৫ই মে, ১৯৪৫। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

ছুটির দিন। সকালে উঠে কলাবাগানের মাঠে বেড়াই। ঠাণ্ডা দিন—ঝড়বৃষ্টি। আজ ছুটি নিয়েছি। আপটন সিনক্লেয়ারের দি জাঙ্গেল বসে পড়ি। একটা গল্প ভাঁজি। স্নান করে আসতে বেলা গেল। বুড়ো এসে গল্প করলে বিকেলে। অমূল্য মহুরির বাড়ি মহোৎসবে খাচ্ছি, এমন সময় এল বৃষ্টি। বিহারী সেনের ছেলের দাওয়ায় উঠে বসলুম। সে তামাক সেজে নিয়ে

এল। অমূল্যের বাড়ি গিয়ে বসে সন্ধ্যার পরে খেতে বসি। রায়মশায় ও আমি ঘোর অন্ধকারে ছাতা ধরে, তিনি অন্ধের মতো আমার পিছনে পিছনে, আমি আগে আগে, এমন অবস্থায় এসে পড়ি। রাত্রে ফকিরচাঁদের বাড়ি রাত ১১টা পর্যন্ত ডিউটি দিই। সকালে উঠেই স্কুল। এসে কল্যাণীর সঙ্গে স্নান করতে গেলুম। এসে ঘুমুই। দি জাঙ্গেল পড়ি উঠে। বিকেলে অমূল্যদের বাড়ি গিয়ে কাঁঠালতলায় না বকুলতলায় বসি আমি আর রায়মশায়। ভগবানের চর্চা অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রাত্রে গোপীদাস আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ন'দি প্রভৃতি বাইরে বসে গল্প করছে।

১৭ই মে, ১৯৪৫। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে স্কুল। ফকিরচাঁদের বাড়ি হয়ে যাই। এসে কল্যাণীর সঙ্গে স্নান করতে যাই। তত গরম নেই। এসে ঘুমাই। ভাবলাম হাটে যাই, পটল কিনে আনি। কিন্তু দেব সাহিত্য কুটিরের চিঠি পেয়ে গেলুম না, গল্প লিখি। ইন্দু বলেছিল, শাঁখে ফুঁ পড়বার তিন মিনিট পরেই যেন তার বাড়ি যাই। কাজ আছে। বিকেলটিতে আজ চমৎকার, মেঘ নেই। বাঁশতলার ঘাটে সাঁতার দিয়ে স্নান করে এলুম; এসে ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি, দরখাস্ত লিখি গোপালের জন্যে। শ্যামাচরণদার বাড়ি ওর শ্বশুর শালার ছেলেমেয়ে এসেচে। হাট থেকে ফেরবার পথে শ্যামাচরণদা ভীষণ রেগে বললে—দেড় মণ চাল দশ সেরে দাঁড়িয়েছে, খি'চ দিয়েচি ভায়া, সব বিদেয় করে দেবো।

উঠে এসে বসি, পিসিমা বলে গল্প করলে কত রাত পর্যন্ত। তারপর শুই, রাত্রে বেশ ঘুম।

২০শে মে, ১৯৪৫। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। রবিবার। পোড়াদহ—কুষ্টিয়া

সকালে উঠে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী পড়ি। দুপুরে স্নান করে এলুম নিমু ও আমি। চাটগাঁ মেলে উঠলুম। কুষ্টিয়াতে নেমে মোটরে বিরিঞ্চিবাবুর বাড়ি। খুব খাওয়ালো। সতীপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে দেখা। মনমোহন কাঞ্জিলালের স্ত্রীর দাদা অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁকে বললুম, এতকাল পরে ১৯২২ সালের পর ২৩ বছর পরে তাঁর বোনের আতিথেয়তার কাহিনী নোয়াখালিতে। সতীপ্রসন্নবাবু গল্প বললেন, দেবতারবাবুর মেয়ের সঙ্গে সুরেশবাবুর ছেলের বিয়ে হল। ভদ্রলোকের বড় কষ্ট, সব মারা গিয়েছে, একটি ছেলে তার অসুস্থ। খাওয়ার পরে ঢাকা মেলে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলুম।

২১শে মে, ১৯৪৫। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। সোমবার। কুষ্টিয়া—কলিকাতা—বনগাঁ

ভোরে কলকাতায় বরদাপ্রসন্নের বাড়িতে ম্যানোলা ও তার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প। সজনীর ওখানে তারাশংকরের সঙ্গে দেখা। গল্প পুরনো দিনের মতো। ডি এমে 'বিচিত্র জগতে'র টাকা নিই। বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে কেউ নেই। মিত্র ও ঘোষ ও এম সি ঘুরে স্টেশনে। তিনটায় ট্রেন—মাঝখানে যেমন গরম ছিল কলকাতা ছাড়বার সময় তেমনি শিল ও বৃষ্টি। বনগাঁয়ে নেমে শুনি শুঁটোর মুখে, ফকিরচাঁদ নেই। আমার বাড়িতে নেই কেউ। মিতে, যতীনদা, মন্মথদা সকলে বসে আড্ডা। মিতের বাড়ি খাই রাত্রে। মিতেনী বসে গল্প করে।

২২শে মে, ১৯৪৫। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। মঙ্গলবার। বনগ্রাম—বারাকপুর

ভোরে উঠে চা খেয়ে বেরুচ্ছি, রমেশবাবু নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিলেন দুপুর পর্যন্ত। সাড়ে ৩টায় বেরিয়ে বাড়ি। কেউ নেই। নদীতে স্নান করে এলুম। একটি রাশ চিঠি এল। ইন্দুর বাড়ি জ্যোৎস্নায় বসি। ফকিরচাঁদের গল্প। কি করে মারা গেল সে। সকলের মুখেই সেই কথা। বাড়ি এসে শুঁটো, পিসিমা ও আমি কত রাত পর্যন্ত গল্প।

সকালে উঠে মনুর জমিতে গেলুম বেড়াতে। আমবাগানের আম কুড়োচ্ছে সব দিকে। ইন্দু এসে গল্প করলে সকালবেলায়। নেয়ে এসে ঘুমুই। গুরুপদ এসে বিরক্তিকর বকুনি বললে। মেঘ করে এল খুব। পিসিমা ভাত রাঁধলেন। ঘুমিয়ে উঠে পড়ি। রাধুর ছেলে এল মোকদর্মা নিয়ে। মেঘ মাথায় নেয়ে এলুম। ইন্দুর বাড়ি জ্যোৎস্নারাত্রে গল্প। বাড়ি এসে ঘুমুই।

২৪শে মে, ১৯৪৫। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

আজ ওরা আসবে বলে সকাল থেকে উঠে সারাদিন ওদের প্রতীক্ষা করেছি, ওরা এল না। সেই মতো আম কুড়ুচ্চি বড় চারাতলায়, শৈশবের সেই অপূর্ব কল্পলোক, ছোটদা রচনা করেছে গায়ে গায়ে কুড়োনোর ফল, পথের ধারে বৈঁচি চারা, কাছেই শেফালী ফুলভরা গাছ—বিকেলের ছায়ায় বনভূমি শান্ত নীরব, সামনে নদীর জল শান্ত নীরব। বাল্যের স্পর্শ এতদিন পরে আবার মনে এল। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি জ্যোৎস্নারাত্রে। কত রাত পর্যন্ত বসে রইলুম। খুড়োরা দুপুরে খাওয়ালে। চিড়ে খাই রাত্রে। চেয়ে চেয়ে দেখি কেউ এলে-গেলে। কেউ এল না।

২৭শে মে, ১৯৪৫। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। রবিবার। পুরীর পথে

সারাদিন কাটল। ভোর হল বালেশ্বরে। আরবারেও এই পথে এসেছি। সেই ফুল ফুটে আছেরাস্তার ধারে। পুরী নেমেই মন্দির দর্শন। ভারী ভালো লাগল। জ্যোৎস্নারাত্রে সমুদ্র দর্শন করি ও বাড়ির ছাদে বসে থাকি।

২৮শে মে, ১৯৪৫। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। সোমবার। ৺পুরীধাম

সারাদিন ঘুমিয়ে কাটে। সন্ধ্যার সময় অমিয় মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা করি ও তাদের হোটেলে বসে গল্প করি। সেই সমুদ্রের বিরাট ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

২৯শে মে, ১৯৪৫। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে লিখে বেরুই। অমিয় মুখোপাধ্যায়ের বাসা হয়ে ধীরেন রায়ের সঙ্গে সেই আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের চা খাই ও স্টেশনে যাই সবাই মিলে রিক্সাতে, বাস রিজার্ভ করতে। সীতা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম কিন্তু সুধীর চৌধুরী ছিল না। ফিরে সমুদ্রতীরে ও পুরী ব্যাঙ্কে। বিকেলে বেরিয়ে ভূপেন সান্ন্যালের বাড়িতে। 'দেবযানের' প্রশংসা করলেন। চাতালে বসে সন্ধ্যায় শাস্ত্র আলোচনা হল, তারপর সবাই মিলে মন্দিরে। ও বলে, আনন্দ রাস্তায়। ওরা মন্দিরে ঢুকল না। আমি মুড়কী কিনে খেলুম। সুন্দর মুড়কী। মন্দিরে ঢুকে ৺জগন্নাথ দর্শন করলুম ও মণিকোঠার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি। স্পষ্ট দেখতে পেলুম ঠাকুরকে। মন্দিরের বাইরে হাওয়া বইচে সেই জায়গাটিতে। বসে ভাবলুম, সেই বড় চারা আমতলায় সুঁড়িপথ হয়েছে, বৈঁচি গাছটি দাঁড়িয়ে, কাছেই সোঁদালী ফুলের ঝাড়। তেঁতুলতলীর আম পড়েছে, কুড়িয়েও এসেছি। আর কোথায় এই বিরাট মন্দিরের ঐতিহ্য। অন্য অন্য বারের মতো পুরনো নুলিয়াকে বললুম—ভালো তো। ফিরে এসে তীরে জ্যোৎস্নারাত্রে কতক্ষণ গল্প করলুম।

৩০শে মে, ১৯৪৫। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বুধবার।

সকাল থেকে বসে বসে বই পড়েছিলাম। স্নান বাড়িতেই করি। বিকেলে চা খেয়ে গৌরীশংকরের সঙ্গে বেড়াতে বার হই। মেয়েরা গেল নরেন্দ্র সরোবরে ৺জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা দেখতে। আমরা রাধাকান্ত মঠে গিয়ে চৈতন্যদেবের গম্ভীরা দর্শন করলুম। সুন্দর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ—ধূপধুনার সৌরভ। ওখান থেকে...ঘর বাড়ি প্রাচীন চিত্রাবলী যেন রূপকথার দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উড়িষ্যার গৃহস্থাপত্য আমাকে মুগ্ধ করে—এখনো প্রাচীন যুগের ছবি এই উড়িষ্যার পথেঘাটেই দেখতে পাওয়া যায়। যেন পালযুগের একটা নগরীর পথে ভ্রমণে বার হয়েছি। বাংলাদেশে ইংরিজি সভ্যতাটা বড় বেশি ঢুকেছে। সেখানে ঝম্পাসিংহ এত দেখা যাবে না পথেঘাটে। মন্দিরের বাজারে গৌরীশংকর মুড়কী কিনলে। খেতে খেতে অনেক কাপড়ের দোকান দেখা হল। অন্নপূর্ণা থিয়েটারে 'রাবণ' প্লে হয়ে রাত নটায়। উড়িয়া থিয়েটার। দোলা রিক্সা করে অন্ধ-ওলি-গলি দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লুম। সেখান থেকে সমুদ্রতীর। আলোকোজ্জ্বল ঢেউ সমুদ্রবক্ষে চিকচিক করচে—যেন হঠাৎ এক সার আলো জ্বলে উঠল অন্ধকারের মধ্যে। জ্ঞানশঙ্কর বেশ ছেলেটি। সে ওর নাম লিখতে বসলে ওর খাতায়। বাড়ি এসে ছাদে বসে গল্প করি। প্রসাদ আসতে দেরী হয়ে গেল বড়। অনেক রাত্রে সাগরজলে জ্যোৎস্না, তাই কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ! ওই দিক পূর্বদিক। শ্যামাচরণদার বাড়ির দিকটা। এখানে এটা সমুদ্র।

৩১শে মে, ১৯৪৫। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে লিখি। সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে বালির ওপর বসে ঢেউ নিই। বিবেকানন্দ এল নাইতে, বল্লে, চলো, চলো। আমি নামলুম না। বিকেলে সভায় গেলুম—রাজবাড়িতে মহারাজা শ্রীশ নন্দীকে সম্বর্ধনা।

ড. মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি। উনি আমার অধ্যাপক ছিলেন। কল্যাণীর সঙ্গে আলাপকরিয়ে দিলুম। তিনি গজেনবাবুর বক্তৃতার অংশ আমার উপর আরোপ করিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—'বিভূতিবাবু বলেছেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা করার কথা...'ইত্যাদি। মনে পড়ে একটা ছবি। কানু ঘোষের লেন, চারু ভট্টাচার্যের বাড়ির দরজা, সকালবেলা, উনি এলেন ছাতা হাতে। রাত্রে ফিরলুম আমি ও কল্যাণী একখানা রিক্সা করে অন্য রাস্তা দিয়ে।

১লা জুন, ১৯৪৫। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে কোথাও বেরুই না। সমুদ্রস্নান করে এলাম। বেশ লাগে। ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম সবাই মিলে। ফিরবার পথে শঙ্কর মঠের বৃক্ষমূর্তি দর্শন করে আসি। বিকেলে কল্যাণী ও আমি সীতুকে নিয়ে সীতাদেবীর বাড়ি গেলুম।

ফিরবার পথে চক্রতীর্থ হয়ে আসছি, দেখি সামনে লাটসাহেবের বাড়ি। তখন পথ চিনতে পারলুম। বীরেন রায় ধরে টেনে নিয়ে গেল রেস্টুরেন্টে, খাইয়ে দিলে চা খাবার। রিক্সা করে বাড়ি ফিরি রাত দশটায়।

২রা জুন, ১৯৪৫। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে বার হয়ে ধীরেনবাবুকে গিয়ে ধরি আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। অমিয়বাবুও সেখানে। বেলাতে এসে সমুদ্রস্নান করি ও পড়ি। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়চে উত্তরে বহুদূরে আমাদের বড় চারা আমগাছের তলায় সেই সোঁদালী গাছটা আর তার তলায় বৈঁচিগাছের বন। আম পেকে পড়ে আছে তেঁতুলতলী আমগাছের তলায়। সন্ধ্যায় মিটিং রাজেন্দ্রভবনে। বক্তৃতা করি।

৩রা জুন, ১৯৪৫। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে উঠে বার হই। টিকিট কেনার জন্য। এদিনও বীরেন রায়ের সঙ্গে গল্প করি। আমরা সি ভিউতে এসে আড্ডা দিই দুপুরে। সমুদ্র-স্নান করি। বিকেলে রমাপ্রসাদ চন্দের ছেলে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। কল্যাণী ও আমরা সকলে চা খাই। কল্যাণীকে নিয়ে বার হই। কিন্তু সেতু সঙ্গে গিয়ে পড়ে গেল। ওর হাঁটু কেটে গেল—কাজেই সমুদ্রতীর ছাড়া আর বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হল না।আমি একা বার হয়ে 'মন্থরা' প্লে দেখি। লাইব্রেরিতে। সেখান থেকে বীরেন রায়ের বাড়ি হয়ে সি ভিউ হোটেলে এসে অমিয়বাবুদের ওখানে বসে গল্প। বীরেনবাবুকে নিয়ে এসে স্বর্গদ্বারের হাওয়া। তুষারকণা বলে একটি মেয়ে ওবেলা একখানা খাতা ও পেন-হ্যান্ডেল উপহার দিলে।

৪ঠা জুন, ১৯৪৫। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে উঠে লিখি ও পড়ি। কোথাও বেরুই না। শরীর খারাপ। স্নান বাড়িতেই করি। এক অধ্যাপক এসে বকবক করে দুপুরকে মাটি করলে। বিকেলে বেরিয়ে মেয়েদের সঙ্গে বিভিন্ন মঠ দেখতে দেখতে ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি হয়ে মন্দির দর্শন করি। ওখান থেকে মুচিপট্টি এসে দেখলুম জুতো হয়েছে কিনা। একটু পরে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এসে দেখি কল্যাণীরা চা খাচ্ছে। ওরা এল দোকানে। টেবিলক্লথ কেনা হল। আমি রিক্সা করে এসেছি। ডিউতে বসে কোনারকে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে এলুম।

৫ই জুন, ১৯৪৫। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

ভোরে এসে বাস ধরে তিনটি প্রাণী রওনা হই। পিপলি, সুন্দরপুর হয়ে বাঁধা রাস্তার ওপর দিয়ে গোপ ও নিমাপাড়া রয়ে কোণারক। বালুর সমুদ্র, ঝাউবন, পোলাং ও হিজলী বাদামের গাছ—তার মধ্যে বিরাট কোণার্ক। সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে সূর্যদেব অভিসারে চলেছেন। কি বিশাল আইডিয়া। ডাকবাংলো থেকে আমি একা মন্দিরে এসে অনেকক্ষণ বেড়ালুম। কল্যাণী এসে আলসেতে বসে রইল। দূরে নীল সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়চে বেশ দেখা যাচ্ছে। বালিয়াড়িঝাউবন—মৃদঙ্গবাদ্যরতা নর্তকীমূর্তির পাশে মদ্যপানমত্ত ভৈরবমূর্তির পদতলে আমরা শুয়ে থাকি। মহাকালের বিরাট শোভাযাত্রা চোখের সামনে দেখলুম। উদাসীন মঠে আম খাই। মিস দাস খিচুড়ি দিলেন। ডাকবাংলোতে ফিরি। নীল মুগনি পাথরের বিরাট সূর্যমূর্তি। মিউজিয়ামে নবগ্রহ মূর্তির আসনে বীরেনদা স্তব পাঠ করলেন। ফিরবার পথে বড় কষ্ট হল। কুয়া থেকে জল তোলা গেল। বীরেনদা গরম মুড়ি কিনে নিয়ে এল। আর কতদূর পিপলি ?বীরেনদা বলে, এখনো সয়দবপুরই এল না। পিঠ টনটন করচে। আর বসা যায় না। এটা কি ?পিপলি। এটা কি ?দামোদরপুর। অতিকষ্টে একটা রেললাইন পার হল। কতক্ষণ আর আছে বীরেনদা ?বীরেনদা ঘুমের ঘোরে বলেন—এইবার চোদ্দনালার কাছাকাছি এল। রাত বারোটায় পুরী। ভ্রমণ সার্থক। আজ একটা বিরাট রূপশিল্পের নিদর্শন দেখলাম। চিরজীবন মনে থাকবে এটা।

৬ই জুন, ১৯৪৫। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বুধবার। ৺পুরীধাম

গায়ের ব্যথা সারি। বার হয়ে অমিয়বাবুর ওখানে। স্বামীজীর ছাতা নিয়ে গেলুম তালপাতার। বিকেলে ভুবনেশ্বরে রওনা। অমিয়বাবুর স্ত্রী, মি. ঘোষ, পাইন ও ফটোগ্রাফার। মালতীপাটপুর, সাক্ষীগোপাল, খুরদা রোড। গান করতে করতে চলেচে সবে। এমন সময় কল্যাণী হঠাৎ বলে উঠল, বি দিয়ে কি একটা স্টেশন যে গেল। আমরা দেখি সেটাই ভুবনেশ্বর। নেমে প্রথম ওয়েটিংরুমে, পরে ধর্মশালায় আশ্রয় নিই। রাত ৪টায় গাড়ি এল। কল্যাণী ও আমি এক গাড়িতে শুয়ে গল্প করতে করতে চলি নগ্ন তমিস্রার জঙ্গল দিয়ে।

৭ই জুন, ১৯৪৫। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার। খণ্ডগিরি—উদয়গিরি—ভুবনেশ্বর—পুরী

৪খানা গাড়ি আগে পরে চলেছে। ভোর হল ঝরনার এদিকে। তারপরেই আর বছরের সেই পাথরের বেড়া দেওয়া বাগান। সেই কৈড়ুকুমারনন্দের গ্রাম্য পাঠশালা—এখন বন্ধ। মুখ ধুয়ে পাহাড়ে উঠে বেড়াই। নেমে এসে সেই উড়িয়া বুড়ির বাড়িতে মুড়ি ও চা খাই। মাসিমা বলে সবাই ডাকে। মাসিমা বল্লেন হাটুরা গাড়োয়ানদের, যারা ভুবনেশ্বর হাটে পাকা কাঁঠাল নিয়ে যাচ্ছে, কাঁঠাল দিয়ে যাও। কিন্তু পাকা কাঁঠালনেই। ভুবনেশ্বর আসবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল গত বছরের মতো। বিন্দু সরোবরে স্নান ও দেবদর্শন করে স্টেশনে কমলা হিন্দু হোটেলে এসে আহার করি। ছেলেরা সিগারেটের টিন নিয়ে বসে আছে—খুব চালবাজ। বিকেলের ট্রেনে পুরী আসবার সময় কল্যাণী ও আমি জগন্নাথ মন্দির হয়ে কৌটো ও মুড়কী কিনি। বাড়ি আসতেই এল বীরেন রায় ও ভবেশ চক্রবর্তী। অসুস্থ হয়ে পড়ি। সবাই মিলে আমায় বাতাস করে। বীরেন রায় এক উড়িয়া কবিকে নিয়ে এল—কবিতা শোনায়। মানভূমের অন্নদা চক্রবর্তী এলেন। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প।

৮ই জুন, ১৯৪৫। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। শুক্রবার। পুরী হইতে কলিকাতা

ভোরে রওনা। আনন্দময়ী মা ও তাঁর শিষ্যরা যাচ্চে। উৎপলা, মীনু—বেশ মেয়েরা। বুদ্ধদেবের বোন সুজাতা। খুরদা রোডে খেয়ে ঘুমুই। কটকে যখন গাড়ি দাঁড়িয়েছে ঘুম ভাঙে। ময়ূরভঞ্জের চীফ রেভিনিউ অফিসার মি. রমাগোবিন্দ দাস আসেন। উৎপলার গান ও গল্প, আনন্দময়ীর দর্শন ও আমার ব্রহ্মবিষ্ণুর বক্তৃতা। রাত হল, তখন হঠাৎ দেখি বলচে জিতেন দাস—আমি বলি এই তো বাংলা মা। কখন উড়িষ্যা থেকে বাংলায় ঢুকেছে। খড়্গপুরে উৎপলা গল্প করে আমার সঙ্গে। ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙলে দেখি একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। মেচেদা। তারপর দেখি কালো ঘাটের জল। সবাই ঘুমুচ্ছে।

১২ই জুন, ১৯৪৫। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। মঙ্গলবার। কলিকাতা

সকালে উঠে কোথাও বেরুইনি। খেয়ে গজেনের দোকান ও সজনীর বাড়ি। বাড়ি এসে গেলুম কালিকা থিয়েটারে। সজনী, অমলা দেবী, কল্যাণী, উমা, মায়াদি, বেঁচা, রবীন মোটরে গেল—ট্রামে বাড়ি। সকালে নরেনদা ও যতীনদার বাড়ি। যতীন বাগচী কবিকে দাদা বলে কিনা।

১৩ই জুন, ১৯৪৫। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বুধবার।

ভোরে উঠে মণি বোসের বাড়ি। কল্যাণীকে নিয়ে যতীন বাগচী ও বুদ্ধদেব ও সুনীতিবাবুর বাড়ি। ৩টায় ট্রেনে রওনা। গরুর গাড়ি করে অনেক দিন পরে গ্রামে। আম এখনো গ্রামে প্রচুর। তেঁতুলতলীর তলায় তেমনি মেঁচিগাছ। নদীতে কল্যাণী ও আমি স্নান করি।

এ বেজায় গরম আজ। ইন্দুর বাড়ি গল্প। কোথায় খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, সমুদ্রতীর আর কোথায় এই ক্ষুদ্র গ্রাম যশোর জেলায়।

১৪ই জুন, ১৯৪৫। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার। বারাকপুর

সকালে উঠে মুখ ধুয়ে পুরনো চিঠি পড়তে বসি। ছায়াশীতল গ্রাম্য পরিবেশ। ইন্দু বসে গল্প করলে সন্দেশ খেলে। অনেক আম পাড়লে শান্ত। স্তূপীকৃত আম। চলি সোজা হরিপদদার বাড়ি, চা খেয়ে ইন্দু হরিপদদা আমি ভ্রমণের কথা বলি। স্নান করি নদীতে। বড় সুন্দর নদীজল। লাগে চমৎকার। কোথা সেই পালংগাছের সারি বালিয়াড়িতে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ—আর জগন্নাথদেবের মন্দিরপার্শ্বে মুড়কীর দোকান। ঘুমুই—কাল রাত্রে ঘুম হয় নি। টুনু তোতা খেলা করচে—দেখে মনে হল এমনি ছায়াশীতল গ্রাম্যপথে একদিন কত আনন্দে খেলা করতুম। বিকেলে গিরিনদার বাড়ি গিয়ে গল্প করি ও আম খাই—তারপর বার হয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম, যেখানে বসে ঊষার চিঠি পড়তাম আট দশ বছর হল। বহুদিন ও মাঠটায় যাইনি। নদীজলে নেমে কি তৃপ্তি। ইছামতীর মতো নির্মলজলা নদী নেই। ভগবানের নাম এখানে স্বতোই মনে আসে। এ যেন ভগবানের আসন।

১৫ই জুন, ১৯৪৫। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে উঠে পড়ি। স্নান করে আসি আমি ও কল্যাণী নদীতে। ইন্দু এসে গল্প করে— আমিও ওদের বাড়ি যাই। বিকেলে স্নান করে আসি—বেশ লাগে। তবে বড়ো গরম। এতদিন পরে এসেও গাছে যথেষ্ট আম। শান্তকে ঘাটশিলা পাঠালুম আম দিয়ে।

১৬ই জুন, ১৯৪৫। ১লা আষাঢ়, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে নিমাই এসে বল্লে, শান্ত ভোরের ট্রেনে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় বেজায় গরম। কেষ্ট বলে বৃন্দাবনের বাবাজী দেখা করতে এল। সে হল বনগাঁর মাখন কম্পাউন্ডারের ভাই। বৃন্দাবনমহিমা কীর্তন করতে লাগল—শুনে যাই। এমন সময় কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। ছুটে গেলুম খুকুদের চারাবাগানে আম কুড়ুতে। ভূষণো জেলেদের মাঠে দাঁড়িয়ে বাঁওড়ের ধারের দিকে আকাশে চেয়ে রইলুম। নীল মেঘের দেবতা যিনি সারা বিশ্বে মিশে আছেন অণুতে অণুতে, যাঁর প্রকাশ ওই কালো আকাশে, ওই দোলায়মান বংশকুঞ্জে।

১৭ই জুন, ১৯৪৫। ২রা আষাঢ়, ১৩৫২। রবিবার। বারাকপুর—বনগ্রাম

আজ সকালে স্নান করে উঠে বনগ্রাম। বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর ওখানে থাকে। সুরেনের ওখানে খেয়ে মন্মথদার বাড়ি। দুপুরে যতীনদা মন্মথদা মিলে আড্ডা। এসেই নদীতে কল্যাণীকে নিয়ে নাইতে গেলুম। ইন্দুর বাড়ি সন্ধে।

২০শে জুন, ১৯৪৫। ৫ই আষাঢ়, ১৩৫২। বুধবার।

ভুল হয়েছে, আজ দশহারা, স্কুলে গেলুম পান্তাভাত খেয়ে। বড় গরম। সকালে ছুটি— ২টাতে। গরম বালিতাতা পথ। বাড়ি এসে ঘুমুই। কল্যাণী তখন চিঁড়ের ফলার খেতে সবে বসেছে, আমি যখন বাড়ি এসেচি—এনেচি মুড়কী ও সন্দেশ। উমাকে বল্লুম ওকে দিতে। আমিও খেলুম। ঘুমিয়ে উঠে লিখি। স্নান করে আসি কল্যাণী ও আমি। ভারি চমৎকার সেই পালংগাছ, সেই ঝম্পা সিং, সেই বালির ওপর দিয়ে ধর্মশালার বাথরুম। ইন্দুর বাড়ি বসে জ্যোৎস্নারাত্রে গল্প করি। বাড়ি এসে বড় খুড়িমা, পিসিমা, এঁদের সঙ্গে গল্প করি অনেক রাত পর্যন্ত।

২১শে জুন, ১৯৪৫। ৬ই আষাঢ়, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

অম্বুবাচীর দিন, যথেষ্ট আম, বেজায় গরম। দুটি নতুন দৃশ্য বা ঘটনা। স্কুল। হাটে পটল কিনি। একটা পুরনো ছাতি তিন টাকা দিয়ে কিনি। পথে আসতে দেখি নীল মেঘ করেছে মাঠের দিকে। ঠাণ্ডা হাওয়া। হাটে আবদুল বল্লে, ওর ঘর পুড়ে গিয়েছে। কানাই মালের বাড়ির কাছে বৃষ্টি এল। বাড়ি এসে কোথাও বেরুইনি। ইন্দুর ওখানে বসে গল্প করি রাত্রে। সুন্দরপুরের গোপাল এসে হাফেজ মিঞার চিঠি দেখালে। ওর ভাই ওকে মেরেচে, নালিশ করতে গিয়েছিল।

২২শে জুন, ১৯৪৫। ৭ই আষাঢ়, ১৩৫২। শুক্রবার।

রোজ কল্যাণীকে বলি মুখ ধুয়ে এসে—কল্যাণী ওঠো...। কিন্তু ও বড়ো ঘুমোয়। আজ উঠিয়ে দিলুম হাবুকে দিয়ে। সকালেই স্নান করে এসেছিলুম। স্কুল। সরকারী ডাক্তারখানায় কালীপদ চক্কত্তি স্কুল বোর্ডের মেম্বারদের ভোট জোগাড়ের গল্প করে। বাড়ি আসতেই শান্ত ও দুটি ভদ্রলোক ঘাটশিলা থেকে এল কলকাতা হয়ে। ওদের চা খাইয়ে আমরা বৈকালে কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে গিয়ে ভগবানের শ্যামল প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি নদীতীরের মাকাললতা ওঠা ঝোপে ও গাছের ডালে। সে অপূর্ব দৃশ্য সত্যি। বড় খুড়িমা আজ বনগাঁ গেলেন। সেই যে তাস খেলা করতে করতে 'যাই যাই' বলে চিৎকার করতুম—সে গল্প করেন। বেশ জ্যোৎস্না। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২৫শে জুন, ১৯৪৫। ১০ই আষাঢ়, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে লিখি। স্নান করে খেয়ে হাবু ও আমি স্কুলে। খুব বৃষ্টি হয়েচে। জল জমেচে সব জায়গায়। বাঁশতলার ঘাটে স্নান করে যেমন উঠলাম ডানদিকের ঝোপে সেই সবুজ মাকাললতা, সাঁইবাবলার মঞ্জরী ও সোঁদালী ফুলের সবুজ শোভায় ভগবানের সৃষ্টির অপূর্বত্ব মনে এল। অর্পূবত্ব নয়, কথাটা ঠিক হচ্ছে এই যে, বীতরূপে এই অদ্ভুত শিল্প, এই দোলায়মান লতা, এই পাখি, এই প্রজাপতি, এই ফুল, এই আশ্চর্য শ্যামপ্রাচুর্য যাঁর মনে নিহিত ছিল তিনি কি চমৎকার শিল্পী ! স্কুলে ভীষণ বৃষ্টি এল—আসবার সময় ঝমঝম জল সারাপথ। সেইদিন ছিলাম পুরী, রাজপথ দিয়ে পুরীর মন্দিরে গিয়েছি, মুচি-শাহীতে গিয়েছি—আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে চা খেয়েচি বীরেন রায়ের সঙ্গে—আর আজ সেই শত বৎসরের এক নিবিড় বর্ষার দিনে কলকল জলস্রোতের মধ্যে রাস্তায় নয়ানজুলি পার হয়ে সবুজ বনঝোপের তলা দিয়ে বিকেলে ছুটির পর স্কুল থেকে ফিরচি। সন্ধ্যায় ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসলুম একটুখানি। বৃষ্টি এল—বাড়ি এসে লিখি। বিকেলে লুচি ও চিঁড়ে খেয়েচি গ্রহণ বলে। রাত ১১টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, ফণিকাকা ডাকচে, ও খুড়ো, খুড়ো, গ্রহণ ছেড়েচে, ওঠো। আমি উঠে দেখি খসা চাঁদের আলো। উঠে একটু দুধ খাই। আবার শুই তারপরে। আজ চূড়ামণি যোগ।

২৬শে জুন, ১৯৪৫। ১১ই আষাঢ়, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

আজ ছুটির দিনটা ভীষণ বাদলা। বসে লিখি। স্নান করতে গিয়ে বাদলার দিনে সাঁতার দিয়েবাঁশতলার ঘাটে এসে উঠলাম। বাঁশতলার ঘাটে উঠে সোঁদালী ফুল ও মাকাললতার সৌন্দর্যে ভগবানের কথা মনে পড়ে। ইন্দুর বাড়ি গেলুম খেয়েদেয়ে। বিকেলে মাঠ দেখতে গিয়ে মনঠাকুরের জমিতে বহুদূরবিস্তৃত সবুজের সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকি। জায়গাটা বেশ। এখানে পূর্বে পটপটিতলার ঘাট ছিল। রামধনু সেতুর কথা পড়লুম। রাত্রে লিখি। বৈকালে ফিরে এসে কল্যাণী ও আমি ঘাটে নাইতে গেলুম। বর্ষা-সন্ধ্যার সজল কালো মেঘ গাঙের ওপারে। বাংলার বর্ষার অপূর্ব সৌন্দর্য সন্ধ্যা। কত সৌন্দর্য থাকে এ পৃথিবীতে। হে মহাশিল্পী কোথায় তোমার লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী Nonne Zoshe আর কোথায় এই বাংলার সবুজ চরের ওপরে কালো বর্ষার মেঘের সমারোহ—বিপুল সৌন্দর্যসম্ভার জগতে। কি লীলা তোমার গ্রহে গ্রহে লোকে। একটা গ্রহই দেখে উঠতে পারলুম না—গোটা বিশ্ব পড়ে আছে। সকালে বৃষ্টি। স্নান করতে গেলুম বাঁশতলার ঘাটে। অনেকগুলো চিঠি আর রেজেস্ট্রি এল। স্কুল। বৃষ্টিটা এসে ইন্দুর বাড়ি। সকালে সকালে এলুম।

২৮শে জুন, ১৯৪৫। ১৩ই আষাঢ়, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকাল থেকে বৃষ্টিমেশা মেঘ। ইন্দু এসে সময় নষ্ট করলে। স্নান সেরে এলুম বাঁশতলার ঘাটে। স্কুল। একটা থেকে বৃষ্টি নামল—অতিবৃষ্টি। ছুটির পরে হাটে এলুম। বিভুদা বল্লে, আপনার জন্যে মাইন্দার যে এইমাত্র গেল স্কুলে। বসলুম সেখানে। মাইন্দার এল। গাড়ি জুড়ে নিতাই দাঁর সঙ্গে বনগাঁ। টাউনহলে সভা হচ্ছে। গোপাল আমায় দেখে সভার মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে। বক্তৃতা দিলাম। রেজাউল করিমের সঙ্গে মন্মথদার বাড়ি। হরিদা, রমেশবাবু, বিনয়দা, রেজাউল করিম ও মিতে। গল্প ও ওয়াভেল প্লান আলোচনা। মন্মথদা বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়ালেন। পান গিলে উঠে সুরেনের বাড়ি। সুরেন বল্লে, থাকো, মাংস খাও। না বলে চলে এলুম। নিতাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে। ১০টায় গাড়ি ছাড়ল। আজ এই দুর্যোগে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুদিনের স্মৃতিসভা করতে যাওয়ার কষ্ট মনে থাকবে। ফণিকাকার বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি এলুম। ১১টার গাড়ি গেল। কাঠ কেটে গিয়েচে জনেরা।

৩০শে জুন, ১৯৪৫। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫২। শনিবার।

কলকাতা যাব বলে তৈরি হচ্ছিলুম। কিন্তু যাওয়া হল না। স্কুল থেকে ছেলেরা খাওয়ালে বলে দেরী হয়ে গেল। এসে লিখি। স্নান করে এলুম কল্যাণী ও আমি। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। শেষরাত্রে কলকাতা।

১লা জুলাই, ১৯৪৫। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৫২। রবিবার। কলিকাতা

রাণাঘাটে ভোর। কলকাতা নেমে জেনারেল প্রিন্টার্স ও সজনীর বাড়ি আড্ডা। বুদ্ধদেবের বাড়ি এসে আহার করি। ট্রামে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট—সেখানে খেলাৎ স্কুলের সরোজবাবু এসে গল্প করলে, কফি খাওয়ালে। অত গল্প ওর সাথে কোনোদিন হয়নি। সজনী এল, গৌরী এল। রোয়াকে বসে চা খান তিনজনে। রমাপ্রসন্নের বাড়ি এসে গৌরী ও আমি আড্ডা। চা খাই। রবিবারে আড্ডা অনেকদিন পরে। বালিগঞ্জে মায়াদির ওখানে এলুম। বিবেকানন্দ এসে বকবক করলে।

২রা জুলাই, ১৯৪৫। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৫২। সোমবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে গৌরীশঙ্করের বাড়ি। খিচুড়ি খেয়ে যেতে বল্লে, খাইনি। সুমথদের বাড়ি গান শুনি। প্রবোধের বাড়ি আসি। ট্রেনে এম সি ও মিত্র ও ঘোষ। ট্রেনে বনগাঁ। গোপাল উঠল হাবড়া স্টেশনে। বড়ো বাদলা বৃষ্টি। বিচিত্র রামধনু উঠেচে ধানক্ষেতের ওপরে যেন Nonne Zoshe Boev।অন্নপূর্ণা গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করি ও চা খাই। বন্ধুর বাড়ি ও রমেশবাবুর বাড়ি হয়ে হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক ইলিশ মাছ হাতে বাড়ি। নেয়ে ইন্দুর বাড়ি গল্প। কাঁঠাল ও ক্ষীর খাই। রেণুর চিঠি এসেচে আজ।

৩রা জুলাই, ১৯৪৫। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে স্নান করে আসি। অনেক চিঠি এল, লীলা বেলার পত্র ইত্যাদি। স্কুল। ওখান থেকে গরুর গাড়ি করে ননীমাস্টার ও সুধীরদার সঙ্গে সুন্দরপুর। দিব্যি বট-অশ্বত্থের ছায়ায় জাওলা বেরোনো আউস ধানের পুরনো পথটা—সেই পথে এই বসবার জায়গাটা তৈরি হয়েছে, পুলের মাঠে, হংসসারস চরা বিলের পাড়টা, প্রাচীন বট গাছটা ভালো লাগে। এদিকে আসিনি কতদিন। সেই পৌষ মাসে আর এই আষাঢ় মাস। ৭ মাস পরে। অথচ এখানেই থাকি। অমৃতদের বাড়ি সালিশ ও বিচার। ঝগড়া দ্বন্দ্ব—দুভায়ে কটুক্তি—রাত ১২টার পরে ওখান থেকে বার হই। অন্ধকার রাত। বাড়ি পৌঁছতে

১॥ টা। সুন্দরপুরে কখনো আসিনি—এর মধ্যে আসিনি কখনো। সেদিন পুরী ছিলাম—আজ পুরনো গ্রাম্য পথ দিয়ে চলেছি।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৫। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে উঠে পড়ি। কাল রাত্রে রাত দুটোর সময় বাড়ি এসেচি। স্কুল। স্কুল থেকে ফিরবার সময় দক্ষিণ দিকে মেঘ করেছে। ঘন নীল মেঘ। একটু পরে ঘোর বৃষ্টি নামল। কোথাওগেলুম না। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসে ভূতের গল্প।

৫ই জুলাই, ১৯৪৫। ২০শে আষাঢ়, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

রোদ কি ! ভীষণ বোদ আজ। কল্যাণীর সঙ্গে সকালে নেয়ে এসে স্কুল। ঘুমুই টিফিনে। হাট যখন করি তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো রোদ। পা পুড়ে যাচ্ছে স্কুল আসবার সময় বাজারে। স্কুল থেকে গিয়ে কল্যাণী ও আমি স্নান করি। কি অপূর্ব সন্ধ্যার দৃশ্য। রাঙা মেঘ। স পর্যাসাৎ—তিনি বাইরে চলে গিয়ে বিশ্ব হয়ে রয়েছেন। শ্যামাচরণদার বাড়ি ও ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। ফণিকাকাও এল।

৬ই জুলাই, ১৯৪৫। ২১শে আষাঢ়, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে স্নান করতে যাবার সময় মাকাললতার অপূর্ব দৃশ্য দেখে সত্যিই মুগ্ধ হই। সবুজ লতার প্রান্তে সবুজ ফল দোদুল্যমান। নিভৃত সবুজ ঝোপ, সকালের রোদ এসে পড়েছে, ঝোপে ঝোপে পাখি ডাকচে। ভগবানের প্রত্যক্ষ শিল্পের পরিচয়। স্নান করে স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে চা খেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে কুঠীর মাঠ। নদীতে স্নান করি তারপর। গঙ্গাহরি এসে গোলমাল করে ধান খাওয়ার জন্যে, রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গল্প করি।

৭ই জুলাই, ১৯৪৫। ২২শে আষাঢ়, ১৩৫২। শনিবার।

আজ ছুটি। সকালে লিখে ইন্দুর বাড়ি বসি। কল্যাণীর সঙ্গে স্নান করে এলুম। ৪টার গাড়িতে মামার বাড়ি।

৮ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৫২। রবিবার। ভাটপাড়া—কলিকাতা

সকালে নৈহাটি, বঙ্কিম জন্মোৎসব। শ্রীজীবন্যায়তীর্থ আলাপ করলেন উপাধি দেবেন বলে। কলকাতায় এসে সজনী ও আমি নামলুম। রেণুদের বাড়ি। সেখান থেকে সজনীর বাড়ি ও রবিবাসর রায়বাহাদুর নিবারণ ঘোষ। খগেন্দ্র মিত্রের গাড়িতে ফিরি। সুইনহো স্ট্রীটে।

৯ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৫২। সোমবার। কলিকাতা-বারাকপুর

সকালে উঠে নীরজাবাবুর বাড়ি। কালী রায়ের বাড়ি। মিত্র ও ঘোষ হয়ে বনগাঁ। অন্নপূর্ণা গোস্বামীর বাসা। খ্যাঁদার গাড়িতে বাড়ি চালকি হয়ে। বালককবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে দেখে ও-ফুটপাথ থেকে এল। এসে আলাপ করল। ক্যানিং টাউনে আছে। চাকরি করচে।

সনস অফ হেভেন সম্পর্কে বই পড়ি ট্রেনে। ছেঁড়া বই। সনস অফ হেভেন তারা যারা অনেক সময় গরিব থাকে। কেউ চেনে না, জানে না তাদের শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের সাকাররূপ। আসক্তিশূন্য মনই ফেলিসিটি অ্যাটেন করে। যে মানুষ পোজড অফ ডিজায়ারস সেই নরক ভোগ করে। সব দেশে সব ধর্মের লোকের মধ্যেই সনস অফ হেভেন আছে। মানুষকে ওপথে নিয়ে যাওয়ার উপায় কি ?তাই ভাবচি।

১০ই জুলাই, ১৯৪৫।২৫শে আষাঢ়, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে স্নান করে এলুম। স্কুল। স্কুল থেকে এসে ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি। কল্যাণীকে নিয়ে নাইতে গেলুম। সুন্দর দৃশ্য। রাত্রে পরেশখুড়োর সঙ্গে গল্প।

১১ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৫২। বুধবার।

ছুটির দিন। খুব সকালে মনু রায়ের জমিতে গিয়ে বসি। আমার সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তিনটি গুঁড়ি সেখানে পড়ে। একজন লোক বল্লে, বাবু আমকাঠ নেবেন ?ইন্দু এল। চা খেলো। গল্প। আমি লিখে উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। ইন্দুর বাড়ি ও ফণিকাকার বাড়ি। আজ রায়মশায়ের নতুন বাড়িতে লোক এসেচে। সত্যনারায়ণের সিন্নি আজ। স্নান করতে আসার পূর্বে মাকালফল দুলচে লতার আগে। দুপুরে ঘুমুই। লিখি। বিকেলে গাড়ি নিয়ে এসে চালকি নিয়ে গেল। অনিল ও অরবিন্দ বসুএল। রাত্রে ফিরি। পুঁটিদিদির সঙ্গে গল্প।

১২ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

শরীর খারাপ। স্কুল কামাই। ঘুমাই ৩ ।।পর্যন্ত। রাত্রে ইন্দুর কাছে গল্প করি।

১৩ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে নৌকাডুবি পড়ি বহুদিন ধরে। মাকাললতার ফল দুলচে তখনো প্রভাতের ঝলমল রোদে। একটু পরে বৃষ্টি এল। স্কুল। ৪টার সময় খুব বৃষ্টি। সন্ধ্যায় অমৃতকাকার বাড়ি বসে গল্প করি। ১৩০৯ সালে দুঃখীরাম রায়মশায় মারা যান। চা দিলে উমা। পুঁটিদিদি গল্প করচে।

নতুন চিন্তা—বহু সুন্দরী মানবী সৃষ্টি করেও ঈশ্বর তাতে আসক্ত হন না। সাধারণ মানুষ হলে ওদের নিয়ে হুড়তো।

Who ne'er in weeping ate his bread

Who ne'er through the nights' sad hours

Hath sat in tears upon his head.

He knows you not ye Heavenly powers.

১৪ই জুলাই, ১৯৪৫। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে স্কুলে গেলুম। স্নান করে। ছেলেরা বললে, খাওয়াবো। আমি না শুনেই বাড়ি চলে এলুম। শরীর ভালো না কল্যাণীর। আমি, ও পঞ্চমীর পালুনি করচে বলে মুড়কী সন্দেশ নিয়ে এলুম। এসেই ওর জ্বর। লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ল। আমি রোদে গেলুম জালান পাড়ার মাঠ দেখতে। রোদে কতক্ষণ বসি। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প।

একটা কথা মনে এল, শ্রীচৈতন্য যদি পূর্বজন্মে কৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে ভাবের ও বিশেষের ও ভেদের রাজ্যে এসে নিশ্চয়ই তাঁর দূর পূর্বজন্মের কথা মনে ভেবে মেঘ দেখে, ময়ূর দেখে, কদমফুল দেখে মূর্ছিত হচ্ছেন পূর্বজন্মের কথা স্মরণে। তেমনি আমাদের নিজের জীবনে বহু বহু জন্মের দূর স্মৃতি এক এক বর্ষা এক এক জ্যোৎস্নাস্নাত নিদাঘ রাত্রি, একএক ঝোপঝাড়, নিবিড় গুলঞ্চলতা ও মেটে আলু, লতা ওঠা বড়ো ঝোপ কিংবা কেয়াকাঁটার ঝোপ আমাদের কোনো ব্যাধজন্ম বা কোনো পক্ষীজন্ম বা কোনো বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতি কেন মনে নিয়ে আসবে না ?অমর্তকাকার বাড়িতে কত গল্প করি। ১৩০৯ সালে দুঃখীরাম রায় মারাযান।

১৫ই জুলাই, ১৯৪৫। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫২। রবিবার।

ছুটির দিন। লিখি। স্নান করতে যাই। পেয়ারাতলার মাঠে রোদের ঘাসের উপর শুয়ে আগের মতো। ভগবান সেই মাকাললতা দুলিয়েছেন। পোকা। একটা কিনা রোজ গিয়ে দেখি। স্নান করে এলুম। খুব রোদ। বৃষ্টি নেই। স্নান সেরে এসে দেখি ননী এসেচে। চা খেলো। আমি চমৎকার আরব্য উপন্যাসের দুপুরে শুয়ে থাকি। অনিল সাধু এল।

সন্ধ্যায় ইন্দুর বাড়ি জ্যোৎস্নারাত্রে গল্প। সিংহসাহেব ও অনুকূলকাকা চিঠি দিয়েছেন।

১৬ই জুলাই, ১৯৪৫। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে লিখি। স্কুল থেকে নতিডাঙ্গা যাবার কথা ছিল। আবদুল বারি ও মহাব্বর বলেছিল ওদের বিবাদ মিটাতে। কিন্তু যাওয়া গেল না। সুধীরদার বাড়ি চা খেয়ে চলে এলাম ননী ও আমি পরেশ খুড়োর কি করে চলবে সে কথা বলতে বলতে। বাড়ি এসে নদীতে গেলুম। সুন্দর রোদে মাকাললতা দুলচে। ফিরে এসে দেখি তিনু বসে। গল্প করি। নোবেল প্রাইজ পেয়ে কে কেমন করলে সে গল্প করচে। ইন্দুর বাড়ি ননী ও আমি ও কালো পাঁচু গল্প করি।

১৭ই জুলাই, ১৯৪৫। ১লা শ্রাবণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে লিখি। যথাসময়ে স্নান করে আসি ও স্কুল। চিঠি এল এম.এ. ক্লাসের সেই ছেলেটির যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেস থেকে পত্র দিয়েছিল গ্রীষ্মের ছুটি আগে। খুড়োদের বাড়ি ঝগড়া হল। বড় খুড়ো কাঁদতে লাগল। স্কুলে বৃক্ষরোপণ সংঘের মিটিং। বাড়ি এসে লিখি। ছানা নেওয়া হল ॥0 আনা সের। স্নান করে এলুম বেলা থাকতে। তিনু ও খুড়ো রোজ গল্প করে। জ্যোৎস্না উঠল, ইন্দুর বাড়ি যাই। হরিপদদা, পাঁচু, মনু খুড়ো রাত্রে ভীষণ গরম। এবারে বৃষ্টি নেই মোটে। রাস্তাঘাটে ধুলো উড়চে। কতদিন থেকে বৃষ্টি হয়নি।

১৮ই জুলাই, ১৯৪৫। ২রা শ্রাবণ, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে লিখি। স্নান ও আহার করে স্কুল। আজ একটু মেঘ ছিল যাবার সময়। বৃষ্টি আদৌ নেই। এসে লিখি ও বেলা গেলে অর্থাৎ যখন শাঁখ বাজছে সন্ধ্যায় তখন কল্যাণী ও আমি আমাদের বাঁশবনে, নদীতে যাচ্ছি সবে। এসে দেখি তিনু ও পরেশ গল্প করচে। জ্যোৎস্না উঠচে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

১৯শে জুলাই, ১৯৪৫। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

রাত্রে ভীষণ গরম। বৃষ্টি নেই। স্কুলে গিয়ে দেখি একটা পাগলা মরে আছে। সকালে ছুটি। মুচিবাড়ির কাছে দেবেন যাচ্ছে হাটে—বলে, আপনার চিঠি দোকানে, দেবেনকে আনতে পাঠালুম। শঙ্কর ও মোহন সাইকেলে আসছে, তাদের পাঠালুম। বাড়ি এসে ঘুমুই, লিখি। মণি (খেলাৎ স্কুলে) চিঠি লিখেচে অনেকদিন পরে। নিমাই এল হাট নিয়ে। নদীতে নেয়ে আসি। ইন্দুর ছেলে হয়েচে, সকালে হরিপদদার বাড়ি গিয়ে বসেছিলুম। শ্যামাচরণদার বাড়ি সত্যনারায়ণ। গিয়ে দেখি কল্যাণী বসে আছে।

২০শে জুলাই, ১৯৪৫। ৪ঠা, শ্রাবণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে যাই। স্কুল। সকাল সকাল চলে এলুম। স্কুলে মেঘ করে এল, অতি চমৎকার দৃশ্য ! তখন, যখন টিফিন, আমি, ননী, মৌলবী সায়েন্সের ঘরে মাদুরে শুয়ে আছি। ভীষণ গরমের পর বেশ সজল ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। দৃশ্য অতি সুন্দর। স্নান করতে গিয়ে মাকাল ফল দেখে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। ইন্দুর বাড়ি গল্প করি ফণিকাকা ও আমি।

২২শে জুলাই, ১৯৪৫। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে লিখি ও পড়ি। বাদলা বৃষ্টি। স্নান করে এলুম। বনগাঁয়ে মিটিং। বীরেশ্বর নিতে এল। গাড়ি ভেঙ্গে গেল চালকিতে। দুজনে বসে রইলুম রাস্তার ধারে—কল্যাণী গেল বাগদীদের বাড়ি। নরেনদার শালা এসে গল্প করচে, এমন সময় গাড়ি এল, ওকেও গাড়িতে উঠিয়ে নিই। ঝমঝম বৃষ্টি। যতীন ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে বসি। সেখানে এল মিতে ও মন্মথদা। সভা হল টাউন হলে। অন্নপূর্ণা গোস্বামী এলেন। একটি ছোট ছেলের আরণ্যক বড় ভালো লেগেচে। ওরা অনেক রাত্রে গাড়ি করে আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল পাকা রাস্তায়। রাত ১১টা। সুন্দর জ্যোৎস্না।

২৫শে জুলাই, ১৯৪৫। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫২। বুধবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে ট্রেনে নৈহাটি নেমে গরমে জুট মিলে। সেই বাল্যে আসতুম। অতি অপকৃষ্ট বস্তি। কলকাতা নেমে সজনীর বাড়ি। শান্তি পাল, তারাশংকর, ভবদেব বসে হাত দেখচে। আমার নাকি বিদেশভ্রমণ ও বহু সাফল্য সামনে...। ওখান থেকে রেণুদের বাড়ি। রেণু কলেজে। সেখান থেকে মিত্র ও ঘোষ। মনোজের সঙ্গে কফি হাউসে গিয়ে কফি খাই। সে বলে, প্রেমেন বলছিল বিভূতি সেন্ট হয়ে গিয়েচে, এখন পাঠকদের মুখ চেয়ে আর কিছু করে না, যা খুশি তাই করে। মণি বোসের সঙ্গে ডেকে আলাপ করলুম। প্রবোধ, তারাশংকর এল। সবাই গল্প করি। যামিনী সোম এসে 'দেবযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বলে, সেই বিভূতিবাবু এই বই লিখেচে ?সেই লোক ?বিশ্বাস হয়না।সুমথ বললে, গল্প অ্যাট হিজ কম্যান্ড। যা থেকে মনে পড়চে গল্প করচে। আপনার ইদানীংকালের গল্পগুলি অসাধারণ। পাঠকদের মুখ চেয়ে লেখকরা যা খুশি ইচ্ছে লিখছে। তারাশংকর প্রবোধ উঠতে দিল না। রেণুর ওখানে যাওয়া হল না। ৭টার ট্রেন রাণাঘাট। বেশ জ্যোৎস্না। দাশুবাবু ও আমি চলে আসি।

২৬শে জুলাই, ১৯৪৫। ১০ শ্রাবণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে পড়ি। লিখতে বসি। স্কুল। হাট করে নিয়ে আসি। বৃষ্টি এল সন্ধ্যার সময়। ঠিক তারপর মি. সিংহ ও মি.পাণিগ্রাহী এসে হাজির।

২৭শে জুলাই, ১৯৪৫। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে মি. সিংহ ও পাণিগ্রাহীর সঙ্গে গল্প। অমূল্য মুহুরির বাড়ি বসে কতক্ষণ কথাবার্তা। চা-পান। এসে স্নান করি। বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠেচি রেণু, বুদ্ধ, রেণুর মা ওরা এল। তারপর আবার কারা এল। আমরা নদীর ধারে গিয়ে বসি। নিবারণের বেগুনের ক্ষেতে বসি কতক্ষণ। তারপর কুঠীর মাঠে বেড়াই। পেয়ারাতলায় বসি। বৃষ্টি এল। ফিরে এসে গল্প করি। তরুণ সংঘের ছেলেরা এল। অমূল্য মুহুরির বাড়ি থেকে এল ডাকতে। ছানা চিনি সন্দেশ খাওয়ালে।

২৮শে জুলাই, ১৯৪৫। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে উঠে মি. সিংহ ও মি. পাণিগ্রাহীকে বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে এলুম। খুব জ্যোৎস্না। বাইরের জগৎ কি তাকে টেনে যে অন্তর্জগতে করচে প্রবেশ ?স্কুল থেকে এসে ঘুমুই। বাইরে শুয়ে।নাইতে যাই—নিবারণের বেগুনক্ষেতে। রাত্রে

ইন্দুর বাড়ি ও শ্যামাচরণদার বাড়ি গেলুম। অনেক রাত পর্যন্ত ছিলুম। কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল আজ। মি. সিংহ ও পাণিগ্রাহী চলে যাওয়াতে মনে কষ্ট হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত পিসিমা, আমি ও কল্যাণী গল্প করি।

২৯শে জুলাই, ১৯৪৫। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫২। রবিবার।

আজ ভোরে কলকাতা যাওয়ার কথা, কিন্তু যাওয়া হল না। মিতে এল সকালবেলা। গল্প শুনলে। চলে গেল। আমি বসে লিখি। কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে গেলুম। খেয়ে বেজায় ঘুম। উঠি ৩টায়। আজ লিখে কল্যাণীর ভাজা পরোটা খেয়ে কুঠীর মাঠে পেয়ারাতলায় দুজনে বেড়িয়ে আসি। নদীতে স্নান করি ও বৃষ্টি এল পরে—সামান্য বৃষ্টি—যদিও মেঘ খুবই করেছিল।

আজ তেরের পালুনি। শাঁখ বাজাচ্ছে—পাকা রাস্তার খেদাইতলায়। সবাই রেঁধে খাচ্ছে সেখানে। আজ লক্ষ্মী ডাংনড়ি হাতে নিয়ে ধানের আলে আলে বেড়াবেন। ছোট বড় ধান এক হয়ে যাবে। এইসব গ্রাম্য। রাজি গোয়ালিনীর মা তেরের দিন সন্ধেবেলা বলত,

ও সেজ ঠাকরুণ, ঘরে কেন আলো ?

উত্তর—গিন্নি গিয়েছেন পালুনি করতে ছেলেপিলে সব ভালো। সেসব দিন কোথায় গেল ! রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসি। বড্ড গরম। ফণিকাকা এল। ফচু ডাকতে গেলে বললেন, এসেচে ও তরুণ সংঘের একটি ছেলে। ঠেস দেওয়ালে কতক্ষণ বসে থাকি। রাত ১১টার গাড়ি গেল।

আজ সকালে চিন্তের বাড়ির বাগানে খুব বড় ও সুন্দর একটা ঝোপ দেখে ভগবানের শিল্পের কথা মনে হয়েছিল।

৩০শে জুলাই, ১৯৪৫। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে লিখি। স্কুলে যাবার সময় সেই মাকাল লতাটা আর টুকটুকে মাকাল ফল—এদের কি অপূর্ব দৃশ্য ! স্কুলে যাই। হাবু আর আমি। আসবার সময় যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসি। বড় চমৎকার লাগে। কল্যাণীর সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, তারপর স্নান করে আসি ঘাট থেকে। তিনুর সঙ্গে গল্প করি। ইন্দুর বাড়ি ফণিকাকা হরিপদদা ওদের সঙ্গে গল্প করি। তেরের পালুনির দিন অনেকদিন পরে এখানে। ছড়কি ছড়কি ভালো কি মন্দ।

৩১শে জুলাই, ১৯৪৫। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে ভীষণ মেঘ করে এল। কি ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ল বকুলতলার বনে, বিলবিলের জলে। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল বটে, কিন্তু ১০ মিনিটের জন্যে। স্নান করে আসবার সময়ে বাঁকা কঞ্চিটা ফেলে এলুম বলে আনতে গেলুম। মাকাল ফলটা টুকটুক করচে সবুজ লতাপাতার মধ্যে ধোয়া লাল টুকটুক ফলটা। গা শিউরে উঠল, মন ভরে গেল। সারা দেহে আনন্দে ছুটল এ দৃশ্যে। সে ব্লিস আমি বর্ণনা করতে পারিনে। ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় ঘন-সবুজ ঝোপে সরু সরু মটর লতা দুলচে, তার মধ্যে কুচো পাতাওয়ালা সাইবাবলা গাছে ঘন সবুজ লতাকুঞ্জে ৮/১০টা টুকটুকে মাকাল ফল, কতকগুলো কাঁচা ফল। স্কুলে গেলুম, বেলা হয়ে গেল ভাবলুম। কিন্তু হেডমাস্টার নেই। ফিরে আসি যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে। বৃষ্টি ফিসফিসিয়ে। তিনুর সঙ্গে গল্প। পাটিসাপটা খাই। বড় মাছ নেওয়া হয়েছিল আজ। খুকু বলেছিল, হাতির মতো ঘরে রয়েচি—দেখতে পাচ্ছেন না ?ইন্দুর বাড়ি গল্প করি—ফণিকাকা, কালোপাঁচুও গয়ায় যাবে বলচে।

১লা আগস্ট, ১৯৪৫। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫২। বুধবার।

রোদ আজ ভীষণ। মেঘের লেশ নেই আকাশে। শ্রাবণ বলে মনে হয় না। যেন জ্যৈষ্ঠ মাস। স্কুল থেকে ফিরচি, তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা বললে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসচে। বলে দেরী করিয়ে দিলে। জিতেন দফাদার ইত্যাদি বসে। বনগ্রামের ছেলেরা এল, আমার জন্মতিথি করবে সেই জন্যে। মেয়ে স্কুলে বসে আলোচনা করি। বাড়ি এলুম যখন পাগলা জেলেদের বাড়ির শাঁখ বাজচে। এসেই কল্যাণী ও আমি নাইতে গেলুম নদীতে। বড় সুন্দর ফেইনটিস রাঙ্গা রোদের ছায়া আমগাছের ডালে, কুল পাতার উল্টো পিঠে। বড় সুন্দর সে দৃশ্য। নেয়ে ফিরে ওই ছেলেদের সঙ্গে পেঁপেতলায় রোয়াকে বসে খুব আলোচনা। আমি ইন্দুদের বাড়ি বসে গল্প করি ফণিকাকা ইত্যাদির সঙ্গে।

২রা আগস্ট, ১৯৪৫। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে লিখি 'অথৈ জল', স্কুলে যাবার আগে সেই মাকাল লতার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখি। স্কুল থেকে হাট করে আসচি, ডাঃ চৌধুরী মোটর নিয়ে যাচ্ছেন হাটে। নন্দ স্যাকরার দোকানের কাছে দেখা হল। মাঠের রাস্তা দিয়ে এলাম। এসে কল্যাণী ও আমি ঘাটে যাই। রাঙ্গা মেঘ হয়েছে, তার ছায়া পড়েচে নদীজলে অদ্ভুত। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যাবেলা। তিনু ও বড়খুড়ো আমার রোয়াকে বসে। 'অভিযাত্রিক' পড়চে।

৩রা আগস্ট, ১৯৪৫। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে মিতে এল কল সারাতে। সকালে লিখে পাঠাই প্রভাতীকে। ভীষণ গরম সারাদিন। উত্তাপের কুয়াশা হয়েচে দুপুরবেলা বাঁওড়ের দিকে। আজ পরিষ্কার আকাশ। স্কুল থেকে ফিরবার পথে মুকুন্দর দোকানে ননী মাস্টার ও আমি চা কিনতে গিয়ে দেরী হল। বাড়ি এলাম যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে। ভীষণ গরম। সন্ধ্যায় খুব জল। তিনু, ন'দি ও খুড়ো বসে 'অভিযাত্রিক' পড়চে। খুব জল হল সন্ধ্যায়। বাদলা বর্ষাদিনের জল নয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টির মতো।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৫। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫২। শনিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

সকালে উঠে লিখি। গল্প শেষ করে নাইতে গেলুম। স্কুলে যাওয়ার আগে অনাথ ও ফণিকাকা এল। স্কুলের সময় বাণী রায়ের ও অন্যান্য পত্র এল। স্কুল থেকে চারটায় সুরমা মেল ধরে কলিকাতা। বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি গিয়ে রাত্রি সাড়ে চারটা পর্যন্ত গল্প।

৫ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে চা খেয়ে ললিতদের বাড়ি। গায়ত্রী অফিসে। সেখান থেকে মণি বোসের বাড়ি চা খাই। মণির স্ত্রী বলে, কেন কল্যাণীকে আনলেন না। নসুমামাদের বাসা। স্নান করে বুদ্ধদেবের বাড়ি। বুদ্ধদেবের স্ত্রী প্রতিভার সঙ্গে বর্ণ-সংক্রান্ত কথা বলে ওখান থেকে ঢাকুরিয়া। সুমথদের বাড়ি শরৎ পাল প্রভৃতির সঙ্গে আড্ডা। প্রবোধ সান্ন্যালের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরে সেখানে প্রেমের গল্প...। ওখান থেকে রেণুদের বাড়ি আসবো, মৃদুলা আমাদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে আসতে ঘোড়া সে যে ছুটল অতিকষ্টে থামে। ওদের নামিয়ে ট্রামে তুলি। রেণুদের বাড়ি বসে গল্প করে ওখান থেকে সজনীর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। নসুমামার বাড়ি। মায়াদি ও নসুমামার সঙ্গে গল্প।

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে উঠে বাণী রায়ের বাড়ি। সেখান থেকে আসতে গিয়ে ট্রামে হরিনাভির সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা। যার নাম শৈলেন চককোত্তি। যে বলত, জ্ঞানবাবু পড়ান ভালো তিনি বলেন স্টুডেন্ট। সে এখন ওকালতি করচে। খেলাৎ স্কুলের রামের সঙ্গে দেখা। বাড়ি এসে স্নান করেই দোকানে। এম-সি ও মিত্র ও ঘোষ।শরৎ পাল এল। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের সেই ছেলেটিএল যার নাম অশ্বিনী। ওখান থেকে তিনটার ট্রেনে উঠে বনগাঁ। রেল লাইন ধরে সাত বেড়ের গেট ছাড়িয়ে এসে ট্যাংরা পার হয়ে একেবারে বাড়ি। বাড়ি এসে কল্যাণী ও আমি নদীতে গেলুম। ফিরে এসে তিনু ও খুড়ো গল্প করচে শুনে ন'দির সঙ্গে একটু কথা বলে ইন্দুদের বাড়ি। হরিপদদা এল সেখানে।

৭ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

সকালে মাঠের ধারে ও নদীতে বেড়িয়ে এসে পড়ি। লিখি না। স্নান করতে যাওয়ার সময় মাকাল লতার ঝোপের শোভা অপূর্ব—ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি সৌন্দর্যের আইডিয়া ! বীজরূপী ব্রহ্মা এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। স্কুলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল। যখন পুরানো ডাকঘরের সামনে তখন একটা শাখায় লতার 'মটরলতা' ও 'মাকাল ফল' পাশাপাশি ফলেচে। সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের রূপটি ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ পরিচয়। তরুণ সংঘে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল। বাড়ি এসে লণ্ঠন নিয়ে নেয়ে এলুম। যদিও তখনো অন্ধকার হয়নি। তিনু ও খুড়ো পথের পাঁচালী পড়চে। চলে যাই ইন্দুর বাড়ি। হরিপদদা, ফণিকাকা ও আমি। কালোপাঁচু সবাই...।

৮ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে উঠে চিন্তের বাগানে সেই অপূর্ব ঝোপটি দেখবার জন্যে সেদিকে বেড়াতে গেলুম। ফণিকাকা চলে গেল আমায় দেখে। কল্যাণী ও আমি স্নান করতে গেলুম—ভীষণ গরম। আজ রোদ উঠেচে বড় বিশ্রী। একে বৃষ্টি নেই—তাতে এই রোদ ! স্কুলে গিয়ে কাগজে আণবিক বোমা ফেলবার খবর শুনলাম জাপানে। নেমন্তন্ন খেতে এলাম মুকুন্দর বাড়িতে

জিতেন, মধুসূদন, আমি ইত্যাদি। এল বৃষ্টি। এতদিন যে বৃষ্টি হয় নি, পা পুড়ে যাচ্ছিল এইমাত্র যখন কালীবাড়ির সামনে দিয়ে আসি, তেমনি ধুলো—সেই আমি ছাতি ধরে প্রবল বর্ষণ থেকে বাঁচবার জন্যে যতীন পরামাণিকের পাশের পথ দিয়ে অতিকষ্টে আসি। সেই নয়ানজুলি দিয়ে জল যাচ্ছে কলকল করে। বাড়ি এসে একটু শুই। বৃষ্টি জোর এল, কালো মেঘ। পাঁচটার সময় বৃষ্টি নামল—তিনু এসে গল্প করতে লাগল। মি. সিংহ চিঠি দিয়েছেন আজ। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

৯ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে মুখ ধুয়ে লিখি। কল্যাণীকে নিয়ে নাইতে যাই। জল বেড়েচে খুব। স্কুলে যাবার পথে বৃষ্টি শুরু হল। টিপ টিপ বৃষ্টি বেলা একটা পর্যন্ত। শ্যামাচরণদার সঙ্গে গেলাম। স্কুল থেকে ফিরে ঘুমুই। তারপর তিনু এসে কেবল বকবক করতে লাগল বলে লেখা হল না। ইন্দুর বাড়ি সন্ধেবেলা গল্প করি।

১০ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে চিন্তের বাড়ির বাগানে ও ওপাড়ার ঘাটে বেড়িয়ে মুখ ধুয়ে ভগবানকে প্রণাম করে এলুম তেঁতুলতলার ঘাটে, দাঁড়িয়ে থাকি। স্কুল গেলুম অনেক বেলাতে। ফলেয়ার দিকে অপূর্ব সুনীল মেঘ করলে, সে মেঘ দেখবার মতো। তার কোলে বক উড়তে লাগল। সবুজ মাঠ, তার উপর নীল কালো মেঘ, তার কালো সাদা বকের পাঁতি। আমি সেকেন্ড পণ্ডিত ও হেডমাস্টারকে দেখালুম, ওই দেখুন হেঁড়ে চোমর মেঘ করেচে। একটু পরে এল ঝমঝম করে জল, ভীষণ ভন্না। এ বছর ওরকম বৃষ্টি হয়নি। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমি, সুধীরদা, ব্রজেনবাবু, সেকেন্ড পণ্ডিত শুয়ে পড়লুম বেঞ্চিতে। তিনটার সময় উঠে বৃষ্টি মাথায় তেলের বোতল হাতে যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে আসতে মাঠে জল বেধেচে দেখে সেখানে একটু বসি। ভ্যাদলা ঘাসে ছাওয়া মাঠে। বাড়ি এসেদেখি কল্যাণী ঘুমুচ্ছে—ওকে তুললাম, অবেলায় ঘুমুতে বারণ করি। তালের বড়া ভাজতে লাগল রান্নাঘরে—আমি সেখানে বসি। ননী এল পাল্লার, বিনু ও মদন এল—বসল। তালের বড়া খেয়ে আমি ইন্দুর ও গিরিনদার বাড়ি গেলুম। ঝিঙ্গে দিলে ও কাঁচাকলা দিলে গিরিনদা। বাড়ি এসে তিনুর সঙ্গে গল্প করি। সুরেন ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে যে ব্যবহার খারাপ করত—তার গল্প। পরোটা ও সুজির পায়েস খাওয়া গেল বাইরে বসে।

১১ই আগস্ট, ১৯৪৫।২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫২। শনিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

সকালে উঠে লিখি। ১১টার ট্রেনে কলকাতা রওনা। মিত্র ও ঘোষের দোকানে বসে কাশী বেড়াতে যাওয়ার গল্প। এম সিতে গিয়ে টাকা নিই। ব্যাপারই এই। কৃষ্ণদয়াল এল, তারপর ৫-৪০-এর ট্রেন ধরি—খুব মেঘ ও বৃষ্টি পথে। গোপালনগরে নেমে খুব বৃষ্টি—গোপাল, পাঁচু, আমি সবাই আটকে পড়লুম। তারপর বোর্ডিং থেকে আলো নিয়ে চলে এলুম যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে। ন'দি শুয়ে আছে মশারীর মধ্যে। উমা ঘরে গিয়ে শুলো। আমি দুধ দিয়ে ভাত খাই—আর কিছু নেই।

১২ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫২। রবিবার।

ছুটির দিন। নদীর ধারে বেড়িয়ে এলাম ওপাড়ার ঘাটে। ভগবানের প্রমাণস্বরূপ ওপারে শ্যামল চর প্রভাতের আলোতে ঝলমল করচে। বাড়ি এলে ইন্দু এল। লিখি। নাইতে গেলুম কল্যাণী ও আমি। নতুন ঘাটে নাইলুম। লম্বা ঘাস সেখানে ডুবে আছে। লিখি গোপাল ঠাকুরের গল্প। ঘুমুই দুপুরে—বৃষ্টি এল। বিকেলে ন'দি, তিনু ও খুড়ো সকলে মিলে পরীর গল্প। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যায় গিয়ে বসি। এসে দেখি ন'দি, পিসিমা, বড়খুড়ি সবাই গল্প করচে।

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫২। সোমবার।

ছুটির দিন। আমাদের ঘাটের শোভা বড় সুন্দর সকালবেলাতে। লেখার ভীষণ ধুম। গোপাল ঠাকুরের গল্প শেষ হল। নেপালের ছেলের বাড়ির পেছনের ঘন বনের অতিসুন্দর সৃষ্টি। ফিরে বাঁওড়ের ধারে ও মাঠে যেখানে গত ফাল্গুন মাসের পর আর কোনোদিন যাইনি—সেখানে বেড়াতে গেলুম। এক জায়গায় বসলুম মাঠের মধ্যে। ঝোপ, ঘাসের শোভা অপূর্ব। বাঁওড়ের ঘাটের পথে কতকাল নামিনি, আজ নামলুম। নদীতে আজ জেলির মা কুমির দেখেচেন। আমরা—কল্যাণী ও আমি নেয়ে এলুম। ঘুমুই দুপুরে। ন'দির সঙ্গে গল্প করি ও লিখি। নদীর ধারে সন্ধ্যার আগে গেলুম—বাঁশতলার ঘাট। অনেক দিন পা দিইনি এ ঘাটে। এ গ্রামের কাছাকাছি জায়গাতেই ২।৩ মাস পরে আসচি। কোথায় ভাগলপুর

ইসমাইলপুরে জালিপাড়া–। ভগবানের কি মহিমা ফুটে উঠেচে নীল আকাশের রংয়ে। ইন্দুর বাড়ি ও শ্যামাচরণদার বাড়ি বসি। শ্যামাচরণদা বক্তিয়ারপুর যাচ্ছে হরকে নিয়ে।

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

নাইতে যাবার পথে দূর থেকে টুকটুকে মাকাল ফল দেখলুম সবুজ ঝোপে, প্রজাপতি উড়চে, সাঁইবাবলার ফুলের দল শোভা পাচ্ছে—যেমন কাল দেখেছিলুম এই মাকাল লতার ঝোপের সঙ্গে একটা। আমডাল, তার পেছন নীল আকাশের সুদূরের যেন কোন্ অনন্তের ইঙ্গিত বহন করে আনে। ভগবান তোমার অদ্ভুত সৌন্দর্যসৃষ্টি। অপূর্ব বিশ্বরূপ। কে বলে অণুর কেন্দ্রে ঐ বিরাট শক্তি রেখেচে যখন আবার এমনি সুন্দর ফল ফুলের সঙ্গীত রচনা করতে পারো, এমন শান্ত দয়ার্ত পরিবেশ। তোমার কথা কিছু বলা যায় না।

জাপান আজ সন্ধিসর্তে সম্মতি দেবার আয়োজনে আছে। পৃথিবী বাঁচে যুদ্ধ থেমে গেলে।স্কুল থেকে আড়াইটের সময় যতীন পরামাণিকের মাঠ দিয়েই এলুম। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি খুব। আজ গৌরীর সঙ্গে বিয়ের দিনটা। কতকাল আগের কথা। এই সেই শ্রাবণ সন্ধ্যা।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে লিখি ঠেস দেওয়ালে বসে। স্কুল ১০টাতে। ৯টার সময় খেয়ে বেরুতে হবে। একটাতে এলুম। এসে ঘুমুই। বড় গরম আজ। বৃষ্টি নেই। লিখি—গল্প লিখে কুচু ও পাঁচুর সঙ্গে কুঠির মাঠে পেয়ারা খেতে যাই। কুচু, পাঁচু গাছে উঠল। পেয়ারা নেই। নদীতে স্নান করে বাড়ি চলে এলুম। তিনু ও খুড়ো বসে আছে। ইন্দুদের বাড়ি গিয়ে যুদ্ধের গল্প হয়।

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে ঠেস দেওয়ালে লিখি। চোরাবাজারের গল্প। স্কুল যাচ্ছি, কারণ পরীক্ষা, যেতে যেতে শুনি দারিঘাটা পুলের কাছে বিজয়োৎসব উপলক্ষে ছুটি, রবি বলে। জাপান আত্মসমর্পণ করেচে। ভগবান তাঁর বিশ্বে শান্তি এনে দিন। বাড়ি এসে সারাদিন লিখি। সন্ধ্যার আগে ও-পাড়ার ঘাটে যাই ও গিরিনদার বাড়ি গিয়ে জাপান যুদ্ধ সংক্রান্ত কথা বলি। ইন্দুর বাড়ি যাই।

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫। ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

এদিন ছুটি বিজয়োৎসবের। বসে বসে লিখি। বড়ো ঝড়বৃষ্টি। নাইতে গেলুম না। কলাইয়ের ডালের খিচুড়ি হল। কোথাও বেড়াতে বার হই না। রাত্রে ইন্দুদের বাড়ি।

১৮ই আগস্ট, ১৯৪৫। ১লা ভাদ্র, ১৩৫২। শনিবার। বারাকপুর—ঘাটশিলা

ভোররাত্রে ঝমঝম করে জল মাথায় বাড়ি থেকে বেরুই। ৬টার ট্রেন ধরে কলকাতা। অপূর্ব বাগচীর বাড়ি যাবার আগে ললিতদের বাড়ি। ললিতের মা চা খাওয়ালেন। অপূর্ব বাগচীর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। অমিয় মুখোপাধ্যায় বেরিয়ে যাচ্ছে, যেতে বল্লে তার বাড়ি। মিত্র ও ঘোষের দোকানে গিয়ে পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করি। খেয়ে এলুম অমিয়র বাড়ি থেকে। ওর বাবা এসেচেন দেশ থেকে। বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা। গিড্‌নীতে এসেই নবীন শাল চারার বন আর নীল আকাশ আর পাহাড়ের কি সুনীল রং। কেবল মনে হতে লাগল মাথার ওপর থেকে একটা চাল সরে গিয়েচে। ফুলমণি রাস্তায় আশ্রমের কাছে আমায় প্রথম দেখে বল্লে, দাদাবাবু ! এসে প্রণাম করলে। বাড়ি এসে দেখি নুটু বাড়িতেই আছে। নুটু বল্লে, কে, দাদা ?বৌমা প্রণাম করলেন। জ্যোৎস্নারাত্রে বাইরে বাইরে বসে ওভারসিয়ার, গোপাল, মিতে, আমি ও নুটু গল্প করি। আতা গাছটি পড়ে গিয়েজানালা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে।

১৯শে আগস্ট, ১৯৪৫। ২রা ভাদ্র, ১৩৫২। রবিবার। ঘাটশিলা

সকালে উঠে মিতা ও আমি নদীর ধারে সেই শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসি। বাড়ি এসে চা খেয়ে বেরুই। বুয়াদের বাড়ি গিয়ে চা খেলুম। বুয়ার সঙ্গে গল্প করি। তার চেহারা খারাপ হয়েছে। নুটুর ডাক্তারখানায় বসি। সেখানে এল হেডমাস্টার, সত্যবাবু ও বিজয় ফৌজদার। বাড়ি এসে স্নান করে খাই ও ঘুমুই। ধরমশাই এসে গল্প করেন। বৈকালে ভটচাজমশায়ের বাড়ি গিয়ে গল্প করি খুব। উনি পাঁজি দেখিয়ে বলেন, আর, একটা যুদ্ধ শিগগিরই এল। সবাই মিলে নানা গল্প মাঠে বসে জ্যোৎস্নায়। মহামোলিয়া গ্রামে বাড়ি একটি ছেলের। তাদের গ্রামে পাহাড়পুজো হয়। একটি গুহা আছে পাহাড়ে, একটি

জলাশয় আছে—তার জল কখনো শুকায় না। অনেক রাত্র পর্যন্ত গল্প করি। উদয়ের দোকানের আমতলায় আজ ডাঃ বোস, নুটু, সুধাংশু সবাই মিলে চা খাই। আমি ভাবলাম পুরীতে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গত জুন মাসেও এরূপ করেচি। কত আমতলায় কত জায়গায় যে আপনার জন আছে।

২০শে আগস্ট, ১৯৪৫। ৩রা ভাদ্র, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে উঠে নদীর ধারে বেরিয়ে এলুম। এসে ছোট ঘরে বসে পুরনো দিনের মতো শুধু লিখি। মিতে এসে গল্প করলে। তারপর স্নান করে এলুম নদী থেকে। ভালো বৃষ্টি খুব। একটি লোক সাইকেলে এসে রাজবাড়ির নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেল। বিকেলে মিতে ও আমি কাপড় কিনতে বেরুই। গেলুম রাজবাড়ি। প্রথমে বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে বলচে, বিভূতিবাবু এদিন যান। প্রকাণ্ড পার্টি। ধনপতিবাবু, রণজিৎ, ডাঃ আডডি, ক্যারিসাহেব, মোহিনী বিশ্বাস, নন্দীবাবু সব বসে গল্প। কৃষ্ণাণ কেবল বলে, নন্দীবাবু, Your brother did not tell me that you are here.

ওখান থেকে জ্যোৎস্নারাত্রে একাই ফিরি। গুঁপোগোপালের সঙ্গে পথে দেখা। দুজন একসঙ্গে আসি। আবার আড্ডা অনেক রাত পর্যন্ত। শচীন, গুঁপো, ওভারসিয়ার, রামকৃষ্ণ আর তার বন্ধু। শচীন দেবযান নিয়ে খুব গল্প করে। ওর মামা রমণীবাবুর বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর স্ত্রী অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আপনি দেশের নারায়ণ। পর্বে যে এসেছে কাছে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি—জ্যোৎস্নায় বসে। শেষরাতে উঠি।

২১শে আগস্ট, ১৯৪৫। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫২। মঙ্গলবার। ঘাটশিলা—কলিকাতা—বারাকপুর

ভোর ছটায় ট্রেন এল। মিতে ও আমি রওনা। দিব্যি শালবন। কলকাতায় এসে মিত্র ও ঘোষ। কালিদাস রায় ও উপেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা। উপেনবাবু বল্লে, চলো দেওঘরে অমরবাবুর ওখানে। হায়, দিন কত এগিয়ে গিয়েচে। এখন সারা ভারত জুড়ে নিমন্ত্রণ পাচ্ছি। কোথায় এর মধ্যে সেখানের অমরবাবু ! কালিদাসদা বল্লেন, তোমার মতো এতবড় সাহিত্যিক ম্যাট্রিকের পরীক্ষক হবে কি ?বি.এ-র জন্য দরখাস্ত করো। মিতে ও আমি ৫-৪০-এর ট্রেনে বনগাঁ। সনৎ (তারাশঙ্করের ছেলে) 'নসুমামা ও আমি' গল্পের বড় প্রশংসা করলেন। পশুপতিবাবুর নাকি বড়ো ভালো লেগেছে। গোপালনগরে নেমে আসচি, ননী মাস্টারের বাড়ি। সুধীরদা, হরিপদদা, জিতেন আমসত্ত্ব ভাগ করছে। সেখানে বসে বাড়ি এসে দেখি তখনো সবাই রান্নাঘরে। জ্যোৎস্না রাত্রি। চিঁড়ে সেবা বাইরে বসে। কোথায় কাল ঘাটশিলা আর আজ বারাকপুর।

২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫। ৬ই ভাদ্র, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে নদীতে স্নান করে আসি। লিখি 'মধুর ভ্রমণ'। স্কুলে যাই ৩টাতে। যাবার পথে সেই মাকাল লতার ঝোপটিতে কি অপূর্ব বর্ণসম্ভার আর কি সৌন্দর্য ! হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। "সেদিন চাঁদের কোণে জমাব তারাগলি।" প্রভৃতি গান গেয়ে ভগবানকে অনুভব করি। স্কুল থেকে বাড়ি আসি যতীন পরামাণিকের গাড়িতে। আজ খুব রোদ। শরতের নীল আকাশ। বিকেলে যখন নদীতে স্নান করতে যাই তখন চাঁদ উঠেচে ওপরে—ভাবচি পরশু এ সময় ঘাটশিলার রাজবাড়িতে পার্টি হচ্ছে। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কথা হল। শ্যামাচরণদাও ইন্দুর বাড়ি জ্যোৎস্নায় বসে—ঘাটশিলা ও যুদ্ধের গল্প।

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৫। ৮ই ভাদ্র, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে লিখি। স্নান করতে গিয়ে মাকাল লতার ফল দেখে মনে বড় আনন্দ হল— সর্বশরীর শিউরে উঠল—কি বিউটি ! স্কুল। এসে ঘুমুই। অনিল সাধু প্রভৃতি এল বনগাঁ থেকে। বকবক করে সন্ধ্যা করিয়ে দিলে। সন্ধ্যায় আমি বাঁশতলার ঘাটে স্নান করে এলাম। তারপর তিনু ও বড় খুড়োর সঙ্গে সামান্য গল্প করি। ইন্দুর বাড়ি, আশুর বৌ এসে নিতুর ওপর অত্যাচারের কথা বলে।

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৫। ৯ই ভাদ্র, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে লিখি। মিতে এসে ওর গল্প দেখালে। সে চলে গেলে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসলুম।কাল রাত্রে নিতু পালিয়ে এসেছিল, সেই গল্প। ঘুমুই। ঝমঝম বৃষ্টি। নিমাই এসে কল্যাণীদের নিয়ে এল। কল্যাণী বল্লে, মান্তু, তোমাকে ফেলে কি করে যাবো—তুমি বলো নিমাইকে, কালই দিয়ে যাক। আমি বললাম, পরোটা করে দিয়ে যাও দুখানা। ও বল্লে, মান্তু, তোমার খাবার আমি দিয়ে যাবো এখন অনাথের হাতে। এখন পরোটা করার সময় তো নেই মান্তু। ও চলে গেলে আমি মাঠে চারাবাগানের পেছন দিয়ে বেড়াতে যাই। কি ঘন কালো বর্ষার মেঘ উড়ে উড়ে যাচ্ছে বেলেডাঙ্গার বটতলার দিকে। অদ্ভুত দৃশ্য ! সেই আজমাবাদের কথা মনে করিয়ে দেয় যেন। সন্তোষ এসেচে, কিশোরীকাকার বাড়ি গল্প করি। চা খাই। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি।

২৭শে আগস্ট, ১৯৪৫। ১০ই ভাদ্র, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে স্নান করে এলুম। এসে লিখি। কল্যাণী বাড়ি নেই—ভাত চড়িয়ে দিই ঝিঙ্গেভাতে দিয়ে। কাল হাট হয়নি, কোনো তরকারি পর্যন্ত নেই। খুকু ভাত বেড়ে দেয়। খাই। স্কুলে গিয়ে দেখি গোপালনগর বাজার ও স্কুল সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে বন্ধ। চোখ দিয়ে জল এল (বাঙ্গলার সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালীর সুভাষচন্দ্র) স্কুলে। হেডমাস্টারের মিটিং হল, তারপর চলে এলুম। বাড়ি এসে ঘুমুই, লিখি। ৪০ টাকা মনিঅর্ডার এসেছিল। 'আজকাল'-এর। ফেরত দিলুম।

বিকেলে কাকিমা চা ও খাবার করে দিলেন। নারান্ন ও তিনু এল। নদীতে গা ধুয়ে এলুম। তিনু ও খুড়োর সঙ্গে গল্প করি। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গোঁসাইবাড়ির মেয়েটির কথা বলি। কাকিমা তরকারি দিয়ে গেলেন। পান্তাভাত খাওয়া গেল ও-বেলায়। ঠেসদেওয়ালে বসে গল্প করি ন'দিদির সঙ্গে। রাত্রে লিখি মশারীর মধ্যে।

২৮শে আগস্ট, ১৯৪৫। ১১ই ভাদ্র, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

অনেকদিন আগে মাঝরাত্রে কলুটোলা স্ট্রীটের অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিংয়ে রাত্রে গরমে ঘুম হয়নি, সেসব কথা মনে এল। সকালে উঠে লিখি সাথীর গল্প। হাবু রাঁধে। স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে ফিরবার পথে জল খেয়ে বাড়ি এসে লিখি। কাকিমা চা করে দিলেন। স্নান করতে গেলুম। কুঠির মাঠে ও নিবারণের বেগুনক্ষেতে। তিনু, ন'দি বসে গল্প করে। ইন্দু রায়ের বাড়ি গিয়ে গল্প করি। রাত্রে ঘুম হয়নি। কি অপূর্ব শোভা সেই মাকাল লতার ! আজ কয়েক বছর এই দেখা সম্ভব হয়েছে। কখনো মাকাল লতা দেখিনি ওভাবে বাল্যদিনের চোখ না-ফোটা সময়ে। বড়ো হয়ে কোনোদিন দেখিনি। আজ ৪ বছর এসময় আছি এখানে। ১৯৪২ সাল, ১৯৪৩ সাল, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫।

২৯শে আগস্ট, ১৯৪৫। ১২ই ভাদ্র, ১৩৫২। বুধবার।

দুটি ঘটনা আজ ঘটেছিল বহুদিন আগে। আজমাবাদ কাছারিতে কুলের টক দিয়ে খেত ভগৎ এবং আজ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং থেকে রাত্রে ভীষণ গরমে নিদ্রাহীন অবস্থায় সকালে উঠে রওনা হয়েছিলুম বারাকপুরে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে।

আজ বাড়িতে কেউ নেই। কে জানত এইদিন কল্যাণী বাড়ি আসবে ঠিক সেই সন্ধেবেলা। আজও সেই বুলুদের বাড়ির কথা উঠবে। স্কুল থেকে ফিরে পড়ি ও লিখি। ঠিক সন্ধেবেলা পুলতলার মাঠে গিয়েছি, এসে দেখি কল্যাণীরা এসেচে। এনেচে কুমড়ো, ডাল। বড় গরম ও ছারপোকা।

৩০শে আগস্ট, ১৯৪৫। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সারাদিন পড়েছি। লিখেছি সামান্য। নিমাইদের বাড়িতে মুড়কি খেয়ে রায়মশায় ও ইন্দুর সঙ্গে গল্প করি। ঘুমুই ঠেসে—কারণ ঘুম হয়নি ২ দিন। আজ বিকেলে খুকুকে নিয়ে নিবারণেরপটলক্ষেতে গিয়ে বসি—তখন ৪টার ট্রেন সবে গেল। গা ধুই ও সাঁতার দিই আমাদের ঘাটে। কলার বড়া হচ্ছে খেলুম। তিনু, নিতাই, নারাণ ও নিতুর সঙ্গে বার্ণিয়ের প্রি-হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করি। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসে গল্প করি।

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৫। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫২। শুক্রবার। বারাকপুর—ভাটপাড়া

আজ কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করে এলুম। খেয়ে স্কুল। ৪টার সময় করুণা মুখুজ্যে আকাইপুরের ও আমি কলকাতায়। ভাটপাড়ায় ছোটমামীমাকে অভিভাষণ লিখে দিই। রাত তিনটে পর্যন্ত জাগি।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫২। শনিবার। ভাটপাড়া—কলিকাতা

ভোরে উঠে কলকাতা। সজনীর বাড়ি গিয়ে চা খাই। পশুপতিবাবুর বাড়ি। জ্যোৎস্না ও বৌঠাকুরুণ এসে গল্প করেন। ডাক্তারখানায় দেখি সনৎ। সে বল্লে, কাকাবাবু, আপনাকে দেখলে দিনটা ভালো যায়। কি জানি আমার প্রতি ওর কিরকম ভক্তি হল। ওখান থেকে মিত্র ও ঘোষ। গজেনবাবু ও আমি দুজনে ট্রামে বরেন্দ্র লাইব্রেরি ও কাত্যায়নী। কপির দাম নিয়ে চলে আসি। রেণুদের বাড়ি গিয়ে কমিউনিজমের কথা। সজনী এসে গল্প নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় 'চিত্রাঙ্গদা' পড়চে প্রবোধ সজনীর বাড়ি—জ্যোতির্ময়ী দেবী সেখানে উপস্থিত। আরো অনেকে। সেখান থেকে ট্রামে পানুমামার বাড়ি।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৫২। রবিবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে উঠে বাড়ি দেখতে। খারাপ বাড়ি, তাই বলে ১২ টাকায়। চট্টগ্রামের এক উকিলের বাড়ি। শরৎ দাসের ফ্যামিলি। ঢাকুরেতে খুব আক্রা, এমন সংবাদ। প্রবোধ, আমি, গজেন, সুমথ, ইন্দু, গৌরী। গজেনের বাড়ি খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেস ধরে বনগাঁ। জিতেন দফাদারের সঙ্গে দেখা। সে নামল বরিশাল এক্সপ্রেস থেকে। তার স্ত্রীর অসুখ। ৪টার ট্রেনে গোপালনগর। হাটে মাছ কিনি। নারাণের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। বাড়ি এসে কল্যাণী ও আমি স্নান করতে যাই নদীতে। ফিরে এসে ইন্দুর বাড়ি গল্প করি। হরিপদদা ছিল। বেশ আগে অনেকদিন পরে এখানে এল।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫২। সোমবার।

লিখি। স্কুল। মাকাললতার ফল দেখে আজ চোখ দিয়ে সত্যিই জল এসে পড়ল। আজ কল্যাণীর জন্মদিন। তাকে ভোরে শিউলি ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলুম। সে তখন ঘুমিয়ে। স্কুলে মাধবপুরের কানাই বিশ্বাস বলে ছেলেটির মৃত্যুর জন্যে ছুটি হল। বড় ভালো ছেলে ছিল। জন্মদিন উপলক্ষে ছেলেরা এবং সবাই গেল। স্নান করে এলুম। দৃষ্টিপ্রদীপ ২য় সংস্করণ এল। ইন্দুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৫২। মঙ্গলবার

আজ স্কুলে গিয়ে খবর পেলাম হেডপণ্ডিতমশাই আর ইহলোকে নেই। কতদিনের লোক। সেই একবার বাল্যকালে তিনি মারা যাচ্ছিলেন, তারপর তাঁকে মাসে টাকার বিধান করে দিয়েছিলুম। খুব মেঘ করে এল। গুমগুম শব্দ। ঠাণ্ডা দিনটা। আজ মনু চিঠি দিয়েচে। বাড়ি এসে দেখি লুচি ভাজচে কল্যাণী। কোথাও যাই না। তিনু ও বড়খুড়োর সঙ্গে গল্প করি। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে ফণি কাকা, হরিপদদা, গজেন, কালোপাঁচুর সঙ্গে দুর্গাপুজো হওয়ার কথাবার্তা হল। প্রথম কলেরা হয়ে মারা যাওয়ার ৩৪ বছর পরে হেডপণ্ডিতমশাই মারা গেলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২১শে ভাদ্র, ১৩৫২। শুক্রবার।

আজ ঈদের ছুটির দিন। বেশ নীল আকাশ, মাঝে মাঝে রোদ ও বৃষ্টি। সকালে আমাদের ঘাটে মুখ ধুয়ে লিখি এসে। ইন্দুর বাড়ি গেলুম। কল্যাণী ও আমি নাইতে গেলুম। ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যেতে বাঁশতলার ঘাটে উঠি। যখন বাঁশতলার ঘাট থেকে উঠে আসচি, দুধারে বর্ষার সজল প্রাচুর্যে কি বনশোভা। টুনটুনি কি তুলোফুসকি ডালে ডালে ঠিক সেই সময়েই নীল আকাশের তলাতেই বেড়াতে লাগল। ভগবানের কি শিল্পসৃষ্টি !Art of the fiery Nebula and gozes।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২২শে ভাদ্র, ১৩৫২। শনিবার।

ঈদের ছুটির দিনটি। সকালে উঠে লিখি পড়ি। কোথাও যাই না। কল্যাণীর সঙ্গে নেমে এসে বসি ও ঘুমুই।

ঝমঝম বৃষ্টি এল। বিকেলে আমাদের ঘাটে নৌকোর ওপর বসে ভগবানের চিন্তা করতে করতে 'রাতুল চরণে সে মালা দলিও' বলতে বলতে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল (প্রমথ বাঁড়ুজ্যে লর্ড প্যাথিক লরেন্সকে তার করেছেন)। আমি স্বয়ং বিশ্বদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্লুম। এই ফুল, এই নদীজল, এই নীল আকাশ, নৌকোটা আবার জলস্রোতে ডুবচে, উঠচে, দুলচে—এর মধ্যে বসে তাঁকে বল্লাম, তোমার যেখানে অপমান...তাঁরা করছে সেখানে আমি বা আমরা মান চাই না। যেন রফা করচি। বল্লাম, আমি অজ্ঞান, অসংযমী এবং অসত্যবাদী সবই সত্যি, তবুও তুমি নিজগুণে এসে আমার হাত ধরো। দেশে দেশে যুগে যুগে তুমি আমি হাত-ধরাধরি করে সহস্র সহস্র জন্মজন্মান্তর অতিক্রম করে অমর জীবনের দীর্ঘ পথে যাবো চলে—কখনো নিঃসঙ্গ, কখনো তুমি আর আমি পরস্পরের সাথী। মন কত বড়ো হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমি যুগাতীত কুলাতীত মানুষ। আমার বাইরের সত্তাটা এক চায়—ভেতরের সত্তাটা অন্যরকম, তা আমি জানি বা বুঝি। একটি বাচ্চা মাছ নিয়ে, সঙ্গে গদা জেলে। নৌকা থামিয়ে মাছটা দিলে জ্যান্ত। নিয়ে আসি। সন্ধ্যায় বড় খুড়ো ওর জীবনের কাহিনী বলে। বসে লিখি। ইন্দুর বাড়ি যাই রাত্রি দশটার সময়ে—চা খাই গিয়ে। গল্প করি।

কল্যাণীকে বলি, মানতু তুমি পড়ো। মনে পড়ে সেই বনগাঁ।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৫২। রবিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

এদিন সকালে উঠে কল্যাণীকে নিয়ে নদীতে গেলুম স্নান করতে। তারপর স্টেশনে। কলকাতা নেমেই ট্রামে সাঁতরাগাছি।

ননী ও জতুর সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প। সেখান থেকে বেণুদের বাড়ি। সজনীদের বাড়ি। সজনীর দেখা পাইনি। রমেশবাবুর বাড়ি এসে দেখি ওরা নেই। বুদ্ধদেববাবুর বাড়ি হর, বাসু ও উপেন বসে। নলিনীদা এলেন রাত্রে। রাত ১২টার সময় গেলেন। আমরা ৩টা পর্যন্ত জাগি।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫২। সোমবার। কলিকাতা—বারাকপুর

ভোরে উঠে গিরিন ঘোষ। পরিমল গোস্বামীর বাড়ি গিয়ে যুগান্তরে লেখা দিই। সজনীর বাড়ি গিয়ে দেখি নেই। জেনারেল প্রিন্টার্সে দেখা পেলুম। ওদের ম্যানেজার হলেন বৈজ্ঞানিক গোপালবাবুর ছেলে। তার সঙ্গে বসে গল্প করি। ট্রামে এম সি। সুরেশবাবুর মোটর নিয়ে আমাকে নিয়ে এসে কনট্রাক্ট করালেন 'ছেলেদের আরণ্যক'-এর। ৫-৪০-র ট্রেনে স্টেশনে। নারাণ ও শ্যামল আলো নিয়েছিল। কুচও ছিল। বাড়ি এসে খাই। কল্যাণীর জন্যে ছবি এনেছি।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

ভোরে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করে আসি। সকালে উঠে লিখি। স্কুলে গিয়ে মনিঅর্ডার পেলুম ২০ টাকার একটি। খুব বৃষ্টি হল দুপুরের পরে। বাড়ি এসে নদীর ঘাটে নৌকোর উপর বসে থাকি কতক্ষণ। নদীজল পানায় পানায় ভর্তি, পোয়ারা ফুল ফুটেচে, মাকাল ফল ও বনকলমীর ফুল—এই সময়ের সম্বন্ধে। কি অপূর্ব মেঘের রং হল পশ্চিম আকাশে ! পাটকিলে রংয়ের। ভগবান কি আর্টিস্ট, আর্টের মধ্যে দিয়েই তাঁর পুজো। গাণিতিক দিন্‌স বলেচেন, তিনি (গড) বড় গাণিতিক, আর্টিস্ট বলে, তিনি আর্টিস্ট—তিনি কি নন তাই ভাবি ! খুড়ো ও তিনু বসে গল্প করচে। আমি ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে লিখি। কল্যাণী ও আমি স্নান করতে যাই। কল্যাণী বসল চারাবাগানে। উঠেই না দেখে বলি, চলে এসো, স্নান করি। জল বেড়েচে খুব। স্কুল থেকে ফিরে নৌকোর উপর বসি। নদীজলে খুব মেঘ করে এল। বৃষ্টি এল। বাড়ি এসে লিখি। রাত্রে অনিল সাধু এল, নারাণ এল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

আজ যখন চারাবাগানের পিছনের মাঠে গিয়ে ভোরে বসেছি—তরুণ ঊষার সত্যিকার অরুণ আভা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। আকাশে অপূর্ব পাটকিলে রংয়ের মেঘ শুরু। স্নান করতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাটে অপূর্ব নীল আকাশ, সাঁইবাবলার গাছ, ঝলমলে শরতের পূর্বাহ্নে মেকি সুন্দর। ভগবানের নাম আপনি মনে পড়ে এই শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে। স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে খাতা খাতা করে ঠুকুমুকু বেঁধে গেল। হাট করে করে ইলিশ মাছ ঝুলিয়ে তেলের বোতল হাতে মস্ত বড়ো সাংসারিক লোকের মতো চলে এলুম। বাড়ি এসে গা ধুয়ে আসবো নিমাইয়ের দাদা এসে কাপড় ও মিষ্টি দিয়ে গেল। ওসব পছন্দ করি না, তবুও হাঙ্গামা। সুধীরদার ছেলে মারা গিয়েছে। বাড়ি এসে শুনে আমি আর নেই। মনে ভয়ানক কষ্ট হল। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

আজ মি. সিংহের চিঠিতে জানলুম সুবোধ চাঁইবাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রভাতীর মণিঅর্ডার ২৫ টাকা পাঠিয়েচে আজ।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে কল্যাণী ও আমি স্নান করে আসি। তখনো আকাশে নক্ষত্র। লিখি। স্কুল সকালে ছুটি। সুধীরদার পুত্রবিয়োগে সুধীরদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি এসে বসি। বিকেলে তবুও লিখি। অপূর্ব রাঙা রোদ যখন নাইতে যাই। সে অপূর্ব দৃশ্য, কিন্তু আমার মন কদিন বড়ো ব্যস্ত। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল। ওখান থেকে ইন্দু রায়ের বাড়ি। রাত্রে গল্প করি।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে উঠে স্কুল। মাছ কিনে ফিরি। স্নান করে আসবার পূর্বে লিখি। ফুচুর সঙ্গে স্নান করে এলুম। সান্যাল, ছোটমামা, গৌরীশঙ্কর, জ্যোতিষদাকে নিয়ে যাই বাঁশতলীর ঘাটে এবং এই ঘাটের ধারেই বেলা ৫টার সময় প্রবোধের সভায় গেলুম গরুর গাড়ি করে। তিনটি ছেলে আসছিল খুলনা থেকে—দেবব্রত, মাধব কুণ্ডু ও নিরঞ্জন হালদার। রমেশবাবুর বাড়ি জল খেয়ে রওনা সভায়। প্রবোধ, গজেনবাবু, গৌরী, ইন্দু, একসঙ্গে গেলুম সভায়। বঙ্কিম চক্কোত্তি, অনুকূল কাকা টেলিগ্রাম করেচেন। মেয়র দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায়, যতীন বাগচী প্রভৃতি বাণী পাঠিয়েছেন। সভার মধ্যে এল ছোটমামা ও খোকন, ওদের মোটরে করে নিয়ে এলুম গ্রামে। বেড়িয়ে চা ও খাবার খেয়ে গেল। স্টেশনে গিয়ে ওদের

উঠিয়ে দিয়ে এলুম। অন্নপূর্ণা গোস্বামীর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করি। লিচুতলার আড্ডায় যাই। গরুর গাড়িতে অন্ন, উমা, রবীন, নারাণ ও সত্য একসঙ্গে এলুম। ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। অনেক রাত্রে জেলি ও মংলা এল।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৫২। রবিবার।

সকাল থেকে লোকের ভিড়। এও ক্রমে কলকাতার মতো হয়ে উঠল। ওরা গেল অনেক বেলায়। স্নান করে আসি কল্যাণীকে নিয়ে। ঘুমুই। লিখি গল্প। বিকেলে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি জ্যোৎস্নায়। জেলি, আমি সবাই গল্প করি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৫২। সোমবার।

সকালে পড়ি। স্কুল। স্কুল থেকে ফিরবার পথে নারিকেল ও তামাক নিয়ে আসি। নদীতে স্নান করে এলুম। তিনু পড়চে আদর্শ হিন্দু হোস্টেল। অমূল্য এসে বই পড়তে লাগল। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি। রাত্রে এল অনিল সাধু অনেক জিনিস নিয়ে। গোপালও।

কবির বড়ো কাজ হচ্ছে বহুধাবিচিত্র জগৎ রূপায়িত করা। কাহিনীটি মাত্র একটি। সূত্র— তাতে গাঁথেন যা খুশি।

গ্যোটে বলেছিলেন—এরূপ রচনায় বেশি দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন বিভিন্ন অংশ হয় সুস্পষ্ট আর সমগ্র ব্যাপারটি রয়ে যায় দুর্জ্ঞেয় এক সমস্যার মতো। এটি মানুষকে প্রলুব্ধ করবে এর অর্থ উদ্ধারের দিকে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১লা আশ্বিন, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

অনেক রাত্রে কাল শুয়েছিলাম। ভোরে উঠে বেড়িয়ে এলুম কিন্তু। স্নানের পূর্বে খুকুদের চারাবাগানের ওপাশের মাঠে গাছের ছায়ায় নীল আকাশের তলায় সেই যে বসলুম রৌদ্রের উষ্ণস্পর্শে সে আমার বড় ভালো লাগল। নুটুর চিঠি এল। স্কুল থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে এলুম। ঝোপে জ্যোৎস্না। মহুলামুহুরি এল। অনেক রাত পর্যন্ত ইন্দুর বাড়ি বসে থাকি।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ২রা আশ্বিন, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে লিখি। কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে যাই। খুকুদের চারাবাগানের মাঠে কল্যাণী ও আমি কুঁচগাছের ফুল বা কি একটা লতার ফুল তুলি। নদী আজ কূলে কূলে ভরা। স্কুল। শনিবারের চিঠিতে কবি বার হয়েছে। পাথুরেঘাটার শীতলকে চিঠি দিলাম। স্কুল থেকে এসে একটু পরে স্নান করতে গেলুম নদীতে। সেই যে জমিতে রংপুর যাবার আগে বসি, প্রেমভাগবত বারবার আসে সেই জমিতে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৩রা আশ্বিন, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

শেষরাত্রে বৃষ্টি খুব। ফণি সেই চটিজুতার মতো ফলের চারাগাছটা নেই, আর একটা সুন্দর ঝোপ, তবে তার লতা শুকিয়ে এসেচে। জামতলায় ফুল ফুটেছে—একটা ঝোপে আজ প্রথম লক্ষ্য করলুম। স্নান করে আসি। স্কুল। ভাগলপুর কলেজে সাহিত্যসভার জন্য বনফুল চিঠি লিখেচে। বাড়ি ফিরি হাট করে। অনিল সাধু এসেচে। বৃষ্টি বৃষ্টি কাদা। কখন যে এ বাদলা কাটবে। সুন্দর শরতে আবার বাদলা কি ?ইন্দুর বাড়ি থেকে অমূল্যের বাড়ি যেতে যাই। গজেন কালোপাঁচুর সঙ্গে লালমোহনের বাড়ির উঠানে গিয়ে চলে এলুম। জীবনের রাত্রে কখনো ওদের বাড়ি যাইনি। কি অপূর্ব জ্যোৎস্না আজ শরতের ! মেঘমুক্ত আকাশ আর অতি সুন্দর জ্যোৎস্না। গিয়ে দেখি ওঁরা সব গল্প করচে রোয়াকে বসে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে লিখি না। কিন্তু স্কুলে গিয়ে গজেনের চিঠি পাই—লেখা চাই। কিভাবে সম্ভব ?ভীষণ মেঘ করে ঝড় বৃষ্টি এল—যেন কালবৈশাখীর মেঘ। ফিরে এলুম। স্নান করতে গেলুম বাঁশতলারঘাটে। খুব জল বেড়েচে। অপূর্ব পূর্ণচন্দ্র উঠল বাঁশবনের মাথায়। ঠিক যেন কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, সেই চাঁদ বাল্যকালে যেমন আমরা খাই খাই করতাম। শ্যামাচরণদাদের বাড়ি গিয়ে গল্প করি। পূর্ণ জ্যোৎস্না। অমৃতকাকার বাড়িতে এড়োর ঘরে বসে গল্প করি। তারপর ইন্দুর বাড়ি ফণিকাকা, হরিচরণদা প্রভৃতি গল্প করে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৫ই আশ্বিন, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে গেলুম। মাংস রান্না হবে বলে ওরা বাটনা বেটে রাখল, কিন্তু আসলে এখানে আজ হল না, মাংস হল না। স্কুল। স্কুল থেকে অনবরত লিখি বড়লোক বাঙালের গল্প।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।৬ই আশ্বিন, ১৩৫২। রবিবার। বারাকপুর—কলিকাতা

ভোরে চমৎকার জ্যোৎস্না। বৃষ্টি নেই। জ্যোৎস্নায় উঠে স্টেশন। স্কুল ছাড়িয়ে জ্যোৎস্না ফিকে হয়ে গেল। স্টেশনে পৌঁছলাম, জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। কলকাতা পৌঁছে গজেনবাবুদের বাড়ি। সুমথবাবুর বাড়ি আড্ডা। মৃদুলা বৌমা চা দিয়ে গেল। সেখান থেকে গজেনবাবুদের দোতলায়। বৃষ্টি। নীরদবাবুদের বাড়ি চা খেতে। মায়াদি সেখানে ছিল। একসঙ্গে বালিগঞ্জে গেলুম। বৃষ্টি পড়চে। কুঞ্জ এসে দৃষ্টি-প্রদীপের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে। ভগবান ও পরলোকতত্ত্ব। রাত্রে খেয়ে শুই।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৭ই আশ্বিন, ১৩৫২। সোমবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে উঠে বসে পানুকাকা ও আমি চা খেলুম। বালিগঞ্জ স্টেশনে ৮-২০-র ট্রেন ধরে অপূর্ব বাগচীর বাড়ি। সেখান থেকে সজনীর বাড়ি। সুরেন মজুমদার সেখানে। তিনি 'মাকাললতার কাহিনী' জোর করে নিয়ে গেলেন। বনগ্রামের জন্মতিথি উৎসবের রিপোর্ট দ্বারেশকে দিয়ে দিলুম। সোজা বাসে গজেনবাবুদের দোকান। মনু এল বালি থেকে। আমরা গেলুম শেয়ালদা। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল মনু। ৪টায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি বৃষ্টি। ছাতা নিয়ে বোর্ডিং থেকে বাড়ি। টেক্সট বুক কমিটির চিঠি এসেচে দেখি।

ইন্দুর বাড়ি বেড়াতে গেলাম। নগেন খুড়ো, ফণিকাকা, বুনোপাড়া থেকে কে একজন লোক এসেচে, সবাই মিলে গল্প করি।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৮ই আশ্বিন, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

ফণিকাকার সঙ্গে দেখা। চিন্তের বাড়ির বাগানে এখন আমি বৃক্ষলতার মধ্যে গিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব চিন্তা করছি। ভগবান ভক্তকে ভালোবাসবেন না কেন ?প্রেমের ধর্মই এই। প্রেমিক যে সে প্রেমিককে ভালোবাসে। প্রেম যে না করেচে সে বলে, ভগবান নিরপেক্ষ কঠোর বিচারক ইত্যাদি। ভগবান ভালোও বাসেন, মানুষের ভালোবাসার সগোত্র বটে সে জানি। কিন্তু সব শ্রেণীর নয়।

অফ দি সেম জিনাস, বাট নট অফ দি সেম স্পেসিস। স্নানে গেলুম কল্যাণী ও আমি। চারাবাগানের পেছনের মধ্যে কল্যাণী ও আমি রোদে বসে। স্নান সেরে উপাসনা। কি সুন্দর কাশফুল ফুটেচে নদীর দুধারে। স্কুলে মেঘ করে এল। মেঘ মাথায় বাড়ি—এসেই নদীতে গেলুম। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলার ঘাটে গেলুম।

কুচু গেল আমার সঙ্গে। বাড়ি এসে চা খাই। শ্যামাচরণদার শ্বশুর এসে অনেক গল্প করে। আমি ইন্দুর বাড়ি গিয়ে বসি—ফণিকাকা আমি প্রভৃতি। খুড়ো।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ৯ই আশ্বিন, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে উঠে লিখি। কল্যাণী ও আমি নাইতে যাবার পূর্বে আমকাঠের সেই যে নাগরদোলা,সেখানে গিয়ে বসি। স্কুল। সেখান থেকে গিয়ে হাজির বাড়ি। নদীর ধারে ভগবানের বিশ্বের আশ্চর্য শোভা দেখি বসে। কাশফুলের কি প্রাচুর্য ! আর আকাশের মেঘের ! ধন্য।

সেই দেবতার ভালোবাসার লাগি
জন্মে জন্মে নবজীবন মাগি

স্নান করে ফিরি। একটু পরে ইন্দু রায়ের বাড়ি গিয়ে বসি। হরিপদদা, ফণিকাকা, গজেনখুড়ো—আমরা সব। রাত্রে যেমন গরম তেমনি আবার মাংস ও পরোটা। ওসব খাওয়ার সময় শীতকাল। অনেক রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল, কি সুন্দর: তখন রাত ১২-৩০টা।

কল্যাণী ও আমি ঠেস-দেওয়ালে বসি। ভাবছিলাম পুনর্জন্মের কথা। বাসনা পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। শ্রদ্ধা বাসনার মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সত্য সুন্দরকে আবিষ্কারকরায়, চাওয়ায় পাওয়ার যে চেষ্টা, তাকেই বলা যায় শ্রদ্ধা বাসনা। যাঁরা মলিন বাসনাকে সংযত করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন ও পরম সুন্দরের, বিরাটের, ভূমার সন্ধান পান, তাঁদের আর জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয় না। অব প্লেটো :—

The soul, if pure, departs to the invisible world, but if lamented by the communion with the body she lingers hovering near the earth and is afterwards born into the likeness or some lower form that which true philosophy refines, along rises to the God's. (Phaedo)

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১০ই আশ্বিন, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে চিন্তের বাগানে। ভগবানের কথা মনে হয়। নিবারণের বেগুনক্ষেতে ইছামতীর ধারে শুধু কাশফুল দেখে ভগবানের অদ্ভুত শিল্পের কথা মনে হয়েছিল। কল্যাণী ও আমি স্নানে যাই। ন'দির ঘাটে। কল্যাণী বলে, একটা ঘাট করে দাও আমায়, ভালো ঘাট, নিজে। বাবা-মার নামে। স্কুল। বনফুলের চিঠি পেলুম ভাগলপুর থেকে। মনুর চিঠি পেলুম।

হাট করে বাড়ি। কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে অনেক আগের দিনের মতো সেই যে ভুঁই থেকে কুঠির দেবদারু গাছ দেখা যেত, সেই জমিতে ও তার পাশের জমিতে সেখানে বসে কুঠির দেবদারু গাছ দেখা যেত, সেই জমিতে ও তার পাশের জমিতে যেখানে বসে বই পড়তুম শীতকালে, সেখানে গিয়ে বসি। কুচু ছিল সঙ্গে, আমরা সোজা চলে এলুম অন্য পথ দিয়ে। ফণি, সতু, কাশীনাথ, গঙ্গাহরির মা, কুমোরদের ছেলে সব মাঠে গরু-মহিষ চরাচ্ছে। স্নান করি না আজ। ঠাণ্ডা পড়েচে বাদলায়। ভগবানের কথা বলি ন'দি ও পরেশখুড়োকে। সেই কথা বিন্দুর বাড়ি গিয়েও। রাত্রে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১১ই আশ্বিন, ১৩৫২। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে ঝড়-বৃষ্টি। তবুও স্নান করতে গেলুম। রবি এসে বিকেলে খায়। কোথাও গেলুম না।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১২ই আশ্বিন, ১৩৫২। শনিবার।

ঝড় ও বৃষ্টি। সকালে স্নান, পরে স্কুল। আসবার সময় যতীন পরামাণিকের রাস্তা দিয়ে এলুম বহুদিন পরে। এসে ঘুমুই—লিখি ও পড়ি। গিরিনদার বাড়ি গিয়ে গল্প করি। বাণী রায়ের চমৎকার কবিতা এল আমার জন্মদিন উপলক্ষে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫২। রবিবার।

ভীষণ জোরে ঝড় ও বৃষ্টি। বনগ্রামে যাওয়ার কথা হয়েছিল সেজখুড়িমার নৌকোতে—কিন্তুনাইতে গেলুম কল্যাণী, কুচু ও আমি। গিয়ে দেখি ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি, বড়ো বড়ো ঢেউ—গেলুম না।সয়ারাম জেলেকে দিয়ে বারণ করালুম। এমন ঝড়বৃষ্টি আশ্বিন মাসে দেখিনি কখনো। দুপুরে দিব্যি ঘুমুই। ঘুমিয়ে উঠেচি, তিনু এল। তারপর স্নান করি। ইন্দুর বাড়ি—হরিপদদা, ইন্দু ও আমি। নুটুর চিঠি এল।

১লা অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৫২। সোমবার।

খুব সকালে উঠে ওপাড়ার ঘাটে মনখুড়োদের পটপটিতলার মাঠে বেড়াই। ওপাড়ার ঘাটে হাত পা ধুয়ে বাড়ি এসে লিখি। বাঁশতলার ঘাটে স্নান করে স্কুলে যাই। স্কুল থেকে তেল নিয়ে ফিরে আবার বনসিমতলার ঘাটে স্নান করি। ইন্দু, হরিপদদা ও আমি গল্প করি। বীরেন কামার এল অনেকদিন পরে।

২রা অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

পটপটিতলার ঘাটে বেড়িয়ে এলুম। ধোপার সংবাদ নিয়ে এল অনাথ সাইকেলে। কল্যাণী ও আমি নাইতে গেলুম। চারাবাগানের ওপারের সেই মাঠ। স্কুল। স্কুল থেকে এসে ফুচুর সঙ্গে যেন আটির কাশের মাঠে—যে মাঠ থেকে কুঠির চারাগাছ দেখা যেত, তারই পাশে ভ্রমণ করে আমরা এসে বসি এক জায়াগায়, সেখানে বড়ো বড়ো কাশফুল গাছ। রাত্রে মাংস ও পরোটা। বড় গরম ও মশা। ইন্দুর বাড়ি ইন্দু ও হরিপদদার সঙ্গে গল্প।

৩রা অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে উঠে লিখি। একাই স্নান করি। স্কুল থেকে এসে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে গেলুম। নদীর ধারে কাশগুচ্ছের সারি। জেলেডিঙি বাঁধা রয়েছে ঘাটে। সন্ধ্যায় শ্যামাচরণদার বাড়ি গিয়ে ফণিকাকা ও হরিপদদার সঙ্গে গল্প করি। সকাল সকাল চলে এলুম বাড়ি। তিনু এসে আছে, ফুচু, ন'দি, বুড়িপিসিমা সবাই উপস্থিত। সকাল সকাল শুয়ে একটু ঘুমুই। কল্যাণী ঘুমুতে দেয় না, শুধু বকে। ও মানতু, কতকাল তোমার সঙ্গে একসঙ্গে আছি, গা ছুঁয়ে বলো আবার ফিরে আসবে। বলো। কল্যাণী তুই ভাবিসনে আমি ঠিক আসবো—আসবো। রাত দুটোতে উঠে রওনা—গাড়ি চালালে দেবেন। শেষ রাত্রে

ট্রেনে। স্টেশনে আরামডাঙ্গার আবদুল বসে আছে। ওর বাড়ি কি করে পড়ে গেল সে গল্প করলে। ট্রেন এল, উঠলুম আবদুলের সঙ্গে। ফুচু, কল্যাণী ও উমা একত্র।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার। বারাকপুর

কলিকাতা—ভাগলপুর

ভোর হল রাণাঘাটে। লোকালে কলকাতা—বালিগঞ্জ। নীরদবাবুর বাসায় এসে টাকা দিয়ে আসি টিকিটের জন্যে। মায়াদি বলেছিল আমার জন্যে। আমি খেয়ে ঘুমিয়ে বাসে বেরিয়ে পড়ি। দোকান। দোকানে প্রবোধ, মনোজ সব একত্র দেখা। গয়া এক্সপ্রেসে রওনা।

বহুদিন পরে বর্ধমান এসে খাবার খাই। দুটি ভদ্রলোক বকবক করতে লাগল। স্টেশনে অনেকে দেখা করতে এল।

৫ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৫২। শুক্রবার। ভাগলপুর

ভোরে ট্রেন এল ভাগলপুরে। বহুদিন পরে ২৮ বছর পরে এলুম এখানে। বলাইয়ের ওখানে এসে উঠি। চা খেয়ে দুজনে বেরিয়ে হেমেনের বাড়ি, চণ্ডীর বাড়ি। চণ্ডী ও অম্বিকের সঙ্গে গল্প। বড়বাসায় গিয়ে চন্দ্রকান্ত পাঁড়ে ও গদাধর পাঁড়ের সঙ্গে ডোমন মণ্ডলের সঙ্গে দেখা। ওপারের ঘরে ওদের সঙ্গে আলাপ। বাসদেও দ্বিরায় চলে গিয়েচে। আমি যে ঘরে বসে পথের পাঁচালীলিখেছিলাম, সে-ঘর ভেঙ্গে গিয়েচে বিহারের গত ভূমিকম্পে। ওরা গল্প করলে। বড় খুশি হই ওদের দেখে। সেই বড়বাসা। সেই ভাগলপুর। বাড়ি এসে খেয়ে একটু ঘুমুই। তারপর কলেজ। সভা। সভাতে টেলিগ্রাম এল বন্দনা সমিতির শ্রীরামপুর থেকে। সভার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি ও কমলকৃষ্ণবাবু রেললাইনের সাঁকো দেখতে গেলুম। যে সাঁকোতে বসে একদিন কত কথা ভাবতুম। কত কথা লিখেছি। কলেজের সেই আমবাগানের সেই তালগাছ। তাল হলে বারাকপুরের কথা মনে হোত। অনেক রাত্রে চলে এলুম।

৬ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে উঠে দেখি গদাধর পাঁড়ে বলাইয়ের বাড়ি বসে। ওর ছেলেকে দেখাবে বলে। তারপর সবাই মিলে বড়বাসা। মকী ও নগেন এল। ফাল্গুনী বললে, মাইজীকে নিয়ে আসুন, আমি কাজ করবো। ওদের দেখে বড় খুশি হলুম। সেই সদর অফিসের ছোট ঘর থেকে বড় হলে খাঁচার মধ্যে বসা। ফ্লাবিডের স্কুল, ওট মিলের বিজ্ঞান, সকালে স্কুল। ফণিবাবু ও আসামের দিনগুলি, সুশীল দে ও কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে কুঠির মাঠে বসা রথের ছুটিতে, বনগ্রামে বাসা, খুকু, কল্যাণী, কলকাতায় মেসবাড়ি, বারাকপুরে বাড়ি তৈরি, ঘাটশিলা, সারান্ডা অরণ্য, গোপালনগর স্কুলে মাস্টারি—তার আগে বনগ্রামে পুরাতন দিনের মতো বাসা, নিচুতলা ও আড্ডা, স্কুলমাস্টারি, যতীন পরামাণিকের পথ দিয়ে রোজ রোজ বাড়ি ফেরা, কল্যাণী রোজ দেখে, ভগবানের নাম করে—তারপর আবার ভাগলপুর ও বড়বাসা, ১৮ বছর পরে। হেমেনের ওখানে কিছুক্ষণ বসে পুরনো দিনের মতো সাঁকোর ধারে বসে বই পড়ি। রিক্সায় চলে আসচি, গদাধর পুরনো দিনের মতো পায়ে হাত দিয়ে বল্লে, হুজুর, আমার ছেলের যাতে চাকরি হয়। আপনার ছোট ভাই—যিনি বংশী বাজাতেন। হেমেনের সঙ্গে পুরনো দিনের মতো কত গল্প করি সি.এম.এস, স্কুলের মাঠ দিয়ে হেঁটে গিয়ে।

৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ২০শে আশ্বিন, ১৩৫২। রবিবার।

তারপর হেমেনের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরি। রণজিৎ সিংহের বাড়ি দেখা গেল সকালে। কতকাল পরে দেখি এইসব। আবার বিকেলে গেলুম অমরবাবুর পুরনো বাসায়। মণি মজুমদারের বাড়িতে। সেই পুরনো অশ্বত্থ গাছটা দেখছি ১৮ বছর পরে। সব কথা মনে পড়ে। এরপর কত দেবব্রত, কত খুকু, কত সুপ্রভা।

নদীর ধারে বনে বসে মেয়েদের সেই চিঠি পড়া। মাঠে মাঠে সোঁদালি ফুল যেখানে ফুটত তার তলায় বিকেলবেলা গ্রীষ্মের ছুটিতে। তারও কত আগে এই বাড়ি, এই অশ্বত্থ গাছ। সভা হল, সভায় দেখা করতে এলেন অকিঞ্চনবাল পাল, যাঁর সঙ্গে বিহিপুর রোডে এসেছিলুম। সেন্ট জন দিয়েছিলুম যাঁকে। বুড়ি হয়ে গিয়েচে একেবারে। বেঙ্গলী ক্লাবে দেখা, সব তাস খেলচে। যেমন দেখেছিলুম কক্সবাজারে। কতকাল পরে শ্লিম্যানের ঠগী কাহিনী খুঁজলুম, পেলুম না। চণ্ডীদের বাগানে গিয়ে বসি কতকাল পরে। অম্বিকা এল। চণ্ডী বললে, কেমন একদিন বলেছিলে সরো, আজ তার উত্তর দিলুম তো ?তারপর মনে মনে সেই দিনটির কথা। সেদিন চণ্ডী, আমি ও উপেনবাবু আমার বাড়ি থেকে এসে চণ্ডীর ওখানে গিয়ে আবার উপেনবাবুর বাড়ি গেলুম। আমি উপেনবাবুর বাড়ি শুয়েছিলুম রাত্রে (কত স্মৃতি, কত কথা)। বামাচরণবাবু মারা গিয়েচেন। ললিতবাবু মারা গিয়েচেন। চণ্ডীর ওখানে খেয়ে বলাইয়ের বাড়ি হয়ে স্টেশনে। সব অধ্যাপক ও ছাত্ররা

স্টেশনে। এত রাত্রে অধ্যাপকরা এসেচে তুলে দিতে। ট্রেন ছেড়ে দিল। আর এক ভদ্রলোক বড়ো যত্ন করলে। এক সাহেব সিগারেট দিলে। মেজেয় শুয়ে দুজনে রাত কাটাল।

৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ২১শে আশ্বিন, ১৩৫২। সোমবার। ভাগলপুর—কলিকাতা—মাহেশ

ভোর হল বোলপুরে। বর্ধমানে চা খাই। দুই সাহেবের সঙ্গে খুব আলাপ। এ সিগারেট দেয়,ও টফি দেয়। শ্রীরামপুরে ছেলেরা নামিয়ে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে, খেয়ে খুব ঘুম দিলুম। ইলিশ মাছের টক রেঁধেছে বেশ। সভা। মনোজবাবু এল। শ্রীরামপুরে যখন এলুম, তখন মনে পড়ল দিদির কথা। একদিন সেকি কাণ্ড ! প্রথম যৌবনের অদ্ভুত দিনগুলি। মনে মনে যুদ্ধ করা দাক্ষিপাড়ার মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে। ছেলেরা তুলে দিয়ে গেল। স্পেশাল ট্রেন যাচ্ছে পুজোর সময়। তাতেই কলকাতা এলুম। একটি মেয়ে সভায় অটোগ্রাফ নিতে এল—বললে, বিরক্ত হচ্ছেন ?বাসে ভিড়। বালিগঞ্জে এসে দেখি কেউ নেই। রাত একা কাটাই। কল্যাণী ঘাটশিলায়, কতবার ভেবেছি।

পরদিন গজেনদের দোকান হয়ে ৪টার ট্রেনে বারাকপুর। নদীতে স্নান করে এসে দেখি শীত লাগচে। তিনু বই-কাগজ পেয়ে খুব খুশি। ইন্দুর বাড়ি বসে ভাগলপুর ভ্রমণের গল্প করি। রাত্রে কিছু খাওয়া হল না।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৫২। শনিবার। ঘাটশিলা

সকালে রমণীবাবুর বাড়ি পুজো দেখতে গেলুম। সমীর ঘোষ, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সঙ্গে গল্প করি। বাড়ি ফিরতেই এল সুরঞ্জন। বিকেলে নির্জনে গিয়ে বসি ফুলডুংরির ওপারে। নির্জন রাত্রি। জ্যোৎস্না সামান্য উঠল। এবার পুজো ভালো নয়। মেঘে মেঘে কেটে গেল।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৫।২৭শে আশ্বিন, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে সুরঞ্জনের গাড়িতে গুরুডি, সঙ্গে নিলাম দাসু ও সুবর্ণদেবীকে। নীরদবাবুকেও। নুটু, ফুচু, সমর, নীরদবাবু। ফার্ণ ও ফুল সংগ্রহ করা হল। ওখান থেকে ফিরে আচার্যির গাড়িতে আবার ভটচাজ সাহেবের বাড়ি ও গালুডি। অনেক রাতে ফিরি। মহাষ্টমীর দিন বেশ কাটল। কল্যাণী, বৌমা, উমা, ফুচু, আচার্যি ও নুটু।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫২। সোমবার।

আজ সারাদিন বাড়িতে থেকে বিকেলে বেরুই। যাবো সমরের বাড়ি। বিড়ির কারখানায় কুয়ার স্বামীর ওখানে। বিকেলে সেনের সঙ্গে দেখা। জ্যোৎস্নারাতে গালুডি।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

আজ বিজয়াদশমী। বেরুই না সকালে। বিকেলে আচার্যি ও সবাই মিলে গালুডি নীরদবাবুর বাড়ি। চৌধুরীদের বাড়ি, বাদলবাবুর বাড়ি। গুটকে, ফুচু, নুটু, উমা, কল্যাণী—সবাই। কত রাত্রে ফিরে তারাপদদের বাড়ি ও ওভারসিয়ারের বাড়ি যাই। আমাদের বাড়িতেই সবাই এলেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে উঠে রওনা। নুটু আমাদের সঙ্গে ধলভূমগড়ে নামল। ফুচু, গুটকে ট্রেনে ওঠাতে এল। সমরের সঙ্গে দেখা ডাক্তারখানায়। হাওড়া থেকে বম্বে মেল।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫। ১লা কার্তিক, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার। কাশী

কল্যাণী জানে সালানপুর আসচি। সারারাত্রি ঐ কথাই বলেচি ওকে। সাসারামে শেরসাহের সমাধি দেখাই। শোন নদী পার হল। প্রেমেন ও বিশু মোগলসরাই-এ এসে দেখা করলে। কাশী যখন দেখা যাচ্চে ডাফরিন ব্রিজ থেকে, তখনো কল্যাণী বলচে, বাবা কি একটা সালানপুর বার করেছে ওরা, খুঁজে বার করলে কি করে ?বাঃ, এ জায়গাটা বেশ তো ! পুরনো পুরনো বাড়ি। আমি বললুম, এ কাশী। গজেনবাবুরা এল। ধর্মশালায় গিয়ে উঠলুম। বিকেলে লাগোয়া ইউনিভারসিটি, দশাশ্বমেধঘাট, বিশ্বনাথের মন্দির ইত্যাদি দেখা হল। সুধাবাবুর বাড়ি।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ২রা কার্তিক, ১৩৫২। শুক্রবার।

সকালে উঠে সোজা দশাশ্বমেধঘাটে স্নান করে এসে দেখি সুরেশ চক্কোত্তি বসে আছে—উত্তরাও। বিকেলে সারনাথ। রাখালবাবুর ছেলে আদ্রিশ সব দেখালে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দশাশ্বমেধঘাটে নৌকায় বেড়িয়ে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট, কেদারঘাটে কেদার দর্শন করে অনেক রাত্রে ফিরি। ভরত মিলাদের আলো দিয়েচে।

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৩রা কার্তিক, ১৩৫২। শনিবার।

আজ সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি ও ঝড়। ভীষণ বাদলা। কোথাও গেলুম না। কল্যাণী নতুন কাপড় পরে খানিকটা বসে রইল। ভালো লাগচে না। কল্যাণী গাড়িতে আমাকে বললে, আমার উপর রাগ করেছ নাকি ?আমি বললুম—না। তখন ও কেঁদে ফেললে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫২। রবিবার। কাশী ও আগ্রা

আজও বাদলা। বিকেলে বেরুই ট্রেনে। বৃষ্টি মাথায়। ভীষণ ঠাণ্ডা। সারারাত্রি ট্রেনে—সকাল ৭টায় আগ্রা। রাস্তা থেকেই ওরা তাজমহল দেখলে। বিকেলে আগ্রা কোর্ট, সেকেন্দ্রা। 'আল্লাহো আকবর' বলে যখন শব্দ করলে, তখন কল্যাণীর কান্না এল। তাজমহল দেখলুম জ্যোৎস্নায়। অনেক আমেরিকান সেই অন্ধকারে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে তাজ দেখছিল। অপার্থিব সৌন্দর্য তাজের। এ মিউজিক ইন স্টোন—সাজাহান জগৎকে দান করে গিয়েছেন একটি মহান সৌন্দর্যের আঁধার। বহু অনুভূতির খোরাক জুটিয়েছেন মানবের। ভগবানও জুটিয়েছেন তাঁর সূর্যাস্তে, বনফুলে, পাহাড়ে, পর্বতে, পাখির গানে—কেউ শোনে, কেউ শোনে না। রাত্রি ১১টার সময়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে যখন তাজমহল থেকে ফিরি, নির্জন রাস্তায় কি সুন্দর লাগছিল ! এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দুধ কেনা হল। আমার জ্বরভাব।

২২শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৫ই কার্তিক, ১৩৫২। সোমবার। আগ্রা

সকাল থেকে শরীর খারাপ। কোথাও বেরুইনি। গৌরীশংকরের সঙ্গে কল্যাণী ও আমি ইতিমাদ্দৌলা বেড়াতে যাই। এসে বিছানা গুছিয়ে রওনা। মথুরা হয়ে দিল্লি। রাত ন'টায় দিল্লি পৌঁছে কত খুঁজেও অপূর্ববাবুর বাসা খুঁজে পাইনি। নকুলেশ্বরবাবুর বাসায় রাত কাটাই। তিনি জায়গা দিলেন।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৬ই কার্তিক, ১৩৫২। মঙ্গলবার। দিল্লি

সকালে অপূর্ববাবুর বাড়ি। বিকেলে ফিরোজশা কোটলা, দুর্গ ও মিউজিয়ম দেখি। রাত্রে দিল্লির চাঁদনী চক ও জুম্মা মসজিদের পাশ দিয়ে এলুম চলে। অনেকে এসে আলাপ করলেন।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৭ই কার্তিক, ১৩৫২। বুধবার।

আজ সকালে উঠে কুতুব। কুতুবে চশমা হারিয়ে টাঙ্গা নিয়ে ফিরে গেলুম। বাসে চলে এলুম। খেতে বসেছি, নীরদ এল। নীরদের সঙ্গে গল্প করি। সবাই মিলে নীরদের বাড়ি গিয়ে আড্ডা দিই। নীরদের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করি। চা খাই। ফিরে এসে ট্রেন ফেল করি। রাত্রে আড্ডা।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৮ই কার্তিক, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে নীরদ এল, ওর দুই ছেলে নিয়ে। মহিমারঞ্জন এল। বেরুলুম কনট প্লেস ও কুইন্সওয়ে হয়ে উইন্ডসর প্লেসে। মহিমার বাড়ি গেলুম সকালে, সেখান থেকে বিড়লা মন্দির, বুদ্ধ মন্দির ও কালীবাড়ি। সন্ধ্যার আগে স্টেসনে দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরে সেকেন্ড ক্লাসে রওনা।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ৯ই কার্তিক, ১৩৫২। শুক্রবার। হরিদ্বার

ভোরে হরিদ্বার। ভীষণ শীত। বেশ জায়গা। ভোলাগিরির ধর্মশালায় মহেন্দ্র সরকার রয়েছেন। প্রবোধের বাড়ি খাই। বিকেলে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট বেড়িয়ে আসি। বড়ো সুন্দর স্থান। সন্ধ্যায় কনখল। একটা ঘাটে দেবমন্দির, বড়ো সুন্দরভাবে থাকি।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ১০ই কার্তিক, ১৩৫২। শনিবার।

এদিন সকালে খুব বেড়াই। ভোলাগিরির ধর্মশালায় গিয়ে ফণিবাবুর আগমনের কথা শুনি। ভাটিয়া ভবনে গেলুম মণীন্দ্র বসু এসেচে কিনা দেখতে। সে গিয়েচে দেবপ্রয়াগে। সাধু জগদীশ্বরানন্দের কাছে বসে গান শুনি।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ১১ই কার্তিক, ১৩৫২। রবিবার। কনখল

আজ সকালে উঠে কনখলে গেলুম। নেমন্তন্ন খেতে। স্নান করলুম রামঘাটে। দক্ষপ্রজাপতির ঘাটে গিয়ে বসি। রামকৃষ্ণ মিশন ও মহানন্দ মিশন দর্শন করি।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ১২ই কার্তিক, ১৩৫২। সোমবার।

মুনিকি রোডে চায়ের দোকানে বসে লিখচি স্বর্গাশ্রম থেকে ফিরে। বেলা ২।। টা। লছমনঝোলার স্বর্গাশ্রম। সকালে বার হয়ে ট্রেনে হৃষিকেশ। পথে অরণ্যশোভা চমৎকার নিম্নশিবালিকশ্রেণীর। হৃষিকেশের ঘাটে স্নান করি ও একটা দোকানে কিছু খেয়ে টাঙ্গা চড়ে লছমনঝোলা ও স্বর্গাশ্রম। লছমনঝোলার কাছে অতি সুন্দর দৃশ্য। কালীকম্‌লিওয়ালার আশ্রম দর্শন করে নৌকায় গঙ্গা পার হই। কল্যাণীর ঘুম পেয়েছিল। সন্ধ্যায় মণি বোসের বাড়ি, ভাটিয়া ধর্মশালায় অনেকক্ষণ গল্প করি। মণি বোসের সঙ্গে ওবেলা হৃষিকেশের বাজারে বাসে দেখা হয়েছিল।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৩ই কার্তিক, ১৩৫২। মঙ্গলবার। দেরাদুন—মুশৌরী

রাত্রি সাড়ে সাতটা। মুশৌরীর হোটেলে বসে লিখছি। আজ সকালে হরিদ্বার থেকে বেরিয়েছি। মহেন্দ্র সরকার দেখা করতে এলেন। মণি বোস এসে স্টেশনে অনেকক্ষণ রইল—ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত। বনের মধ্যে দিয়ে দেরাদুন। এবং তখুনি বাসে মুশৌরী এলুম। একটা হোটেলে উঠলুম। বিকেলে বেরিয়ে নিচের উপত্যকার দৃশ্যটি অতি অপূর্ব। একটু পরে অপূর্ব গোধূলির আলো ও অদ্ভুত নীল আকাশের দৃশ্য বিস্ময়কর মনে হল। তারপর দেরাদুনের আলো জ্বলল ও আজপুরের আলো জ্বলল তখন তার স্তরে স্তরে সজ্জিত পাহাড়ে পাহাড়ে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলোর দেওয়ালী—অবর্ণনীয় তার সৌন্দর্য। একটা হোটেলে ঢুকে চা ও প্যাটিস খেলুম। অনেক দূর গেলুম হেঁটে। নিচে অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে এক একটা ঘর, যেন ছায়াবীথির মধ্যে আলো জ্বলচে—সত্যিই অপূর্ব। সুন্দরী মেয়েরা যাতায়াত করচে। লোকগুলি বিনয়ী ও নম্র। ভূস্বর্গ বলেই মনে হল। শীত বেশি বটে, তবে এখন খুব বেশি নয়। সুন্দর স্থান। নুটুকে পত্র দিলাম।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৫। ১৪ই কার্তিক, ১৩৫২। বুধবার। মুশৌরী

খুব সকালে উঠেছি। বেজায় শীত। ভাবছি মি. সিংহকে একখানা চিঠি দেবো। চা খেয়ে সবাই বেরুলাম। সান হিলে গিয়ে চিরতুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গ দর্শন করে ক্যাপিটল থিয়েটার-এর কাছে এসে নামলুম। হিঙ্কম্যাল (?)-এর কাছ দিয়ে কিতাবঘর পর্যন্ত গেলুম। ওরা চলে গেল। আমি ও কল্যাণী ফিরতে ফিরতে একস্থানে দাড়ি কামাতে বসলুম। বাড়ি এসে খেয়ে ঘুমুই। তারপর আবার বেড়াতে বের হই। বিকেলে বেরিয়ে জংশন। ফুল ও ক্যাসেলব্যাক রোড দিয়ে চিরতুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গ দেখে সন্ধ্যায় কিতাবঘরের গোল জায়গাটিতে ফিরে এলুম।

১লা নভেম্বর, ১৯৪৫। ১৫ই কার্তিক, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার। মুশৌরী—দেরাদুন

আজ সকালে উঠে বেরুলাম। হোটেলওয়ালার সঙ্গে বিলের টাকা নিয়ে একটু গোলমাল হল। সোজা মোটরে স্টেশনে এলুম। চড়াই উৎরাই উঠতে উঠতে প্রাণ গেল। বাসে উঠে ভাবলুম, এতদিন পরে ফিরবার সুযোগ ঘটল। দেরাদুন পৌঁছে নরেশ পালের বাড়ি উঠলুম। এক ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েরা এসে রান্না করলেন। প্রকাশ সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াই। দেখি সবটা। দেশের কথা ভাবি—কতদূরে বারাকপুর গ্রামের রোদপড়া স্নিগ্ধ বাঁশতলা। লাহোর এক্সপ্রেসের এলাহাবাদ কোচে উঠে রওনা। ভোর হল মোরাদাবাদে।

২রা নভেম্বর, ১৯৪৫। ১৬ই কার্তিক, ১৩৫২। শুক্রবার। মোরাদাবাদ—লক্ষ্ণৌ

পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে জুড়ে দিলে এলাহাবাদ কোচ। গাড়িতে কেমন সব লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। এ ওকে চা খাওয়ালে, ও ওকে ভাত খাওয়ালে। এর ঘটি ও নিচ্চে, ওর সিগারেট এ খাচ্ছে। কি চমৎকার ! হরদুন স্টেশনে গাড়ি বদলে এক ভীষণ ভীড়ের মধ্যে ঢুকলুম। লক্ষ্ণৌ স্টেশনে কিছু লোক নেমে গেল তাই রক্ষে। প্রতাপগড়ে সন্ধ্যা, তখনো দেখছি। কল্যাণী ও গৌরী খেতে গেল রেস্টুরেন্ট কার-এ। বেনারস ক্যান্টনমেন্টে এল ফিরে। তারপর শুয়ে পড়লুম। অনেক রাত্রে দেখলুম আরা বলে একটা স্টেশন।

৩রা নভেম্বর, ১৯৪৫। ১৭ই কার্তিক, ১৩৫২। শনিবার। ঝাঁঝা—ঘাটশিলা।

ভোর হল ঝাঁঝায়। মনে হল দেশে ফিরে এসেছি এতকাল পরে। তারপর চলল শিমূলতলা। মধুপুর, জসিডি, কারমাটার। চেনজার লোকেরা স্টেশনে বেড়াচ্ছে। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দুন, পানজাব এক্সপ্রেসের জন্যে অপেক্ষা করচে। কারণ ৩০০ মাইলের এদিকে পাঞ্জাব মেলে উঠতে দেবে না। এল সালীমপুর। সেই সালীমপুর বাংলাদেশে ঢুকলুম,

তারপর এল ব্যান্ডেল, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী। হাওড়ার পুল দেখা গেল কতকাল পরে। হাওড়া স্টেশনে নেমেই তক্ষুনি বম্বে মেলে ঘাটশিলা। ঝাড়গ্রামে দেওয়ালি। বাড়ি পৌঁছে গেছি।

৭ই নভেম্বর, ১৯৪৫। ২১শে কার্তিক, ১৩৫২। বুধবার। চাঁইবাসা।

সকালে ট্রেন ছাড়ল। কেমন সুন্দর পাহাড় ও শিলাখণ্ডের দৃশ্য। মি. সিনহার বাড়িতে ভবানী সিংহের মৃত্যুর খবর শুনি মিসেস সিনহার মুখে। এমন সময় মি. সিনহা এলেন। আমায় নিয়ে গেলেন ডাক্তার বাড়ি ও মি. গুপ্তের বাড়ি। মিসেস গুপ্ত সুন্দরী মহিলা—চা খাওয়ালেন। মিসেস চ্যাটার্জি বলে একজন এলেন। প্রসাদের বাড়ি গেলুম তখন, আবার বিকেলে গিয়ে একটা মুক্তপ্রান্তরে পুরনো য়ুরোপিয়ান ক্লাবের কাছে বসি। অদূরে বড়দোলা পাহাড়শ্রেণী। এই চিটিমিটি—ভবানী সিংহের ট্রাজিক মৃত্যুর কক্ষভূমি। রাত্রে বিহার ক্লাবে একজিবিশন। সবাই গেলুম। কোলহান পার্কের পুকুরে দুজনে স্নান করি ওবেলা।

৮ই নভেম্বর, ১৯৪৫। ২২শে কার্তিক, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে হেঁটে সেই সুবোধের বাড়ির পেছন দিয়ে প্রসাদের বাড়ি। চা খাই। বাংলোর পাশে পাহাড়ের পাশে বসি বনের মধ্যে পাথরের উপর। কত কি পাখি ডাকচে। ভগবানের নাম করি। সিভিল সার্জেনের কাছে যাই হাসপাতালে। গল্প করি। ডাকবাংলোতে গিয়ে দুর্গা নাপিতকে ডাকতে দুজনের সঙ্গে দেখা। ফিরে আবার এপার। কোলহান পুকুরে স্নান করি লাল ফুলের মধ্যে। রাত্রে রওনা। মি. সিনহা তুলে নিয়ে গেল। নসিরাম সারা ট্রেন মুকুলের কীর্তিকলাপ ও সুবোধের ইনজিনিয়ারিং সম্বন্ধে বল্লে। বাড়ি গিয়ে দেখি কেউ নেই। লুই কোম্পানির বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েচে। অনেক রাত্রে এল।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৫। ২৭শে কার্তিক, ১৩৫২। মঙ্গলবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে সজনীর বাড়ি গিয়ে চা খাই ও ভ্রমণের গল্প। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ হয়ে বারাকপুর। এসে ইন্দুদের বাড়ি গল্প। বেশ চমৎকার লাগে এতকাল পরে। কোথায় বরদোলা পাহাড়ে, কোথায় হরিদ্বার, কোথায় মুশৌরী, কোথায় দিল্লি, কোথায় এই বাঁশবনের স্নিগ্ধতা।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৫। ২৮শে কার্তিক, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে বাজারে গিয়ে কিছুই পাইনে। দোকান বন্ধ। অনেকদিন পরে বেশ লাগে গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামলতা। বিকেলে কুঠির মাঠের ধামে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। বেশ চাঁদ ওঠে। কল্যাণী ও আমি নাইতে যাই নদীতে দুপুরে। বেলা যায় খেতে।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

আজ কল্যাণী ও আমি সকালে বাঁশবনে বেড়াতে যাই। এসে ও চা করে। করুণা এল। ছেলেরা বাইরে এসে পড়ে। বাঁশতলার ঘাটে নাইতে গেলুম। বেশ লতাপাতার স্নিগ্ধ গন্ধ। স্কুল। স্কুল থেকে এসে চা খেয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে যাই। ইন্দুর বাড়ি গল্প। করুণা রাত্রে এল পড়তে। বোষ্টম-বৌ রান্নাঘরে বসে বড়ির ডাল বাটচে। আজ চিঠি পেলুম নীরদবাবুর ছেলে আলো মারা গিয়েচে।

২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বুধবার। বারাকপুর

সকালে চিঠি লিখি। আকুল এল পড়তে। বাঁশতলার ঘাটে নাইতে যাই। স্কুল। আজ বড়ি দেওয়া গেল। কিশোরকাকার বাড়ি গিয়ে ভ্রমণের গল্প। শুনলুম ভববন্ধুমামা এসেচে, কিন্তু গিয়ে দেখি চলে গিয়েচে। বাঁশবাগানের দিকে যখন এলুম, তখন সন্ধ্যা হয়েচে। ইন্দুর বাড়ি থেকে হরিপদদার বাড়ি। তারার মতো হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা।

আসবার সময় বরকত বলে এক ছোকরা বলচে, বেলাতালির বৌকে সে নিকে করেছিল, এখন ওকে তাড়িয়ে দিয়েচে, ওর বিচার করতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে।

২২শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে চিঠি লিখি ও স্নান করি বাঁশতলার ঘাটে। হাট করে প্রায় সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি। জ্যোৎস্নার অপূর্ব সৌন্দর্য। ইন্দু রায়ের বাড়ি থেকে হরিপদদার বাড়ি এসে তারার সম্বন্ধে গল্প করি। বাঁশবনে সন্ধ্যার দৃশ্য এমন সুন্দর লাগে সন্ধ্যার সময়।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। রবিবার। কলিকাতা

সকালে উঠে চা খেয়ে ঢাকুরিয়া। গজেনদের বাড়ি আড্ডা। গৌরীদের বাড়ি যাই। সেই ছোকরাকে ঝড়ের পেত্নী গল্প করি। নীরদবাবুর বাড়ি গিয়ে আলোর কথা শুনি ও বলি। কেষ্টুবাবু এসে ওর বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর মেয়ের বাজে গান শোনালে। বাণী রায়দের বাড়ি এলুম। সেখানে কালীপদবাবুর সঙ্গে দেখা। সেই কালীপদ যার সঙ্গে মহিমের বৌভাতে দেখা। সে নাকি বাণী রায়ের মাস্টার ছিল। এখান থেকে সুইনহো স্ট্রীটে এসে নীরজা চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করি। রাত্রে পানুমামা এল। গল্প করি।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। সোমবার। কলিকাতা—বারাকপুর

সকালে উঠে বুদ্ধদেবের বাড়ি গল্প। রাধারানীদের বাড়ি কেউ নেই, নরেনদাও বাড়ি নেই। মিত্র ও ঘোষের দোকান হয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ। অন্নপূর্ণা গোস্বামীর বাড়ি চা খেয়ে ৪টার ট্রেনে নেমে বড় কাটা মাছ কিনে বাড়ি। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার। বারাকপুর

সকালে উঠে বাঁশবনের পথে বেড়াতে গেলুম। বেশ শিশির-স্নিগ্ধ প্রভাত। বনভূমি। স্নান করে স্কুল। বেরিয়ে মুড়কি কিনে বাড়ি। সামান্য একটু পরে ইন্দুদের বাড়ি। সেখান থেকে গঙ্গাহরিদের দোতলায় যাই তারার কেস নিয়ে।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বুধবার।

সকালে বাঁশবাগানের দিকে না গিয়ে চিন্তের বাগানের দিকে বেড়াতে যাই। সেই যেখানে গত বর্ষাকালে ভোরে গিয়ে একটা ঝোপের সৌন্দর্য দেখে সকালে ভগবানের কথা মনে আসত। মানুষ ভগবানের সমান হতে পারে জ্ঞানে। সে-জ্ঞান এক জীবনেই লাভ হতে পারে। কিন্তু ভক্ত তা চায় না। সে বলে, একটা অত বড় ভরসা মানুষের, তিনি আছেন। সুখে-দুঃখে তিনি। তাঁর প্রেম জীবনের অর্থাৎ এক জীবনের নিয়ে কথা নয়, জন্ম-জন্মান্তরের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভগবান গেলে থাকবো কাকে নিয়ে ?ভগবান বোধ হয় মানুষ নিয়ে থাকেন। তিনি চান বিশ্ব। আমরা না হলে তাঁর চলে না। আমবাগান দেখে এলুম। বিক্রি করবে বলচে হরিপদদা। নেয়ে স্কুল। সকালে সকালে ফিরি। ফিরে চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে নিভৃত বাঁশবনের পথে ফণি চক্কোত্তির সেই বাঁশবনের মাঠে যাই। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। হরিপদদা বলে, ঐ বাগান নাও। মি. সিংহ ও সুবোধ চিঠি লিখেচে।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে অভিভাষণ লেখায় হাত দিই। মীরাট অধিবেশনের অভিভাষণ। স্নান করে এলুম বাঁশতলার ঘাটে, কল্যাণী ও আমি। ঝোপের মাথায় বুনো সীম হয়েছে, কল্যাণী বল্লে, তোলো মানতু তোলো। স্কুলে গেলুম বেলা হলে। হেডমাস্টার অনুযোগ করলে। সেকেন্ড পণ্ডিত বল্লে সই করার পর। বাড়ি এলুম হাট হয়ে মাছ কিনে। কল্যাণীর পেটের অসুখ, তাকে রাত্রেও খেতে দিলুম না। ইন্দুর বাড়ি এলুম গল্প করতে।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৫। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

বড্ড শীত। গল্প করি বেড়িয়ে এসে। লিখি। খুব সকালে স্কুলে গেলুম না খেয়ে। এলুম দেড়টার সময়। এসে একটু ঘুমুই। বৈকালে বাঁশবনে দাঁড়িয়ে ভগবানের কথা মনে হল। রাত্রে...কে টাকা দিই। পাটালি চুরি নিয়ে রাত্রে হৈ-হৈ কাণ্ড।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। শনিবার।

সকালে উঠে বাঁশবনে বেড়িয়ে এসে লিখতে বসি। কল্যাণীর সঙ্গে নাইতে যাই বাঁশতলার ঘাটে অনেক বেলায়। স্কুলে গিয়েও বসে থাকি অনেকক্ষণ। স্কুল থেকে তেল, চাল ও ঘি নিয়ে ফিরি। চা খেয়ে কল্যাণী ও আমি ফণিকাকার মাঠের বাঁশবনের দিকে বেড়াতে যাই। ইন্দুর বাড়ি বসে গল্প করি।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। রবিবার।

সকালে উঠে বনগ্রাম। বেশ লাগল সকালবেলা। মিতে ও আমি আড্ডা। মন্মথদার বাড়ি। সুরেনের ওখানে গল্প। গুরুপদ নিয়ে গেল ওর বাড়ি। গোপাল এল। অন্নপূর্ণা গোস্বামীরা ডাকতে এল। রেললাইন দিয়ে হেঁটে মিজান (?)পার্ক দিয়ে বারাকপুর। ন্যাদো জেলে বসে আছে বলাইয়ের ভুঁই দেখাবে বলে। সে দেখালে ট্যাংরার ওপারের জমি। ফিরে এসে

চা খেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে পড়ন্ত রোদে বাঁশবনের নিবিড় ছায়ায় গিয়ে বসে। ফিরে এসে ভগবানের নাম নিই। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২।সোমবার।

সকালে উঠে লিখি পড়ি। অনেক বেলায় কল্যাণী নাইতে গেল না, আমি নাইতে গেলুম। এসে স্কুল। স্কুল থেকে ইন্দুদের বাড়ি।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। মঙ্গলবার।

আজও অনেক বেলায় স্কুল। অনেক বেলায় কল্যাণী নাইতে গেল না, আমি নাইতে গেলুম। এসে স্কুল। স্কুল থেকে ইন্দুদের বাড়ি।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বুধবার।

আজও অনেক বেলায় স্কুল। কল্যাণী ও আমি স্নান করতে যাই। অন্ন গেল কল্যাণীর সঙ্গে ওঘাটে। তারপর স্কুল।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে একটু পরেই স্কুল। ওখানে গিয়ে মাথা ধুই। দুটোর সময় মুকুন্দ, জীতেন, সুধীরদা, ননী ও আমি গল্প করতে করতে সিমলে দাসবাবুর বাড়ি। সেখানে বৌভাতের নিমন্ত্রণ খাই। একটি ছেলে বেশ চিঠি লিখেচে। ২৫ টাকা পাঠিয়েচে গল্পভারতী। অনেক রাত্রে ফিরি ভূতের গল্প করতে করতে। ঝুমুদের বাগানে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। বাড়ি এসে কিছু খাই না। বড় শীত।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। শুক্রবার।

আজ নদীর ধারে কলাবাগানে এক জায়গায় গিয়ে বসি স্নানের আগে। যে-ঘাটে নাইলুম, সে সে-ঘাটটিও নির্জন। কত সব কি ফুল ফুটে আছে সেখানে। দেরীতে স্কুল গেলুম। মৌখিক পরীক্ষা নিতে বেলা গেল। হাটে এসে কিছুই পেলাম না।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। শনিবার।

আজও সেই ঘাটে, সেই ফুল। ফুল ফোটা জায়গায় গিয়ে বসি স্নানের আগে। নতুন জায়গায় স্নান। দেরীতেই স্কুলে যাই। গিয়ে দেখি পরীক্ষা হল না। চুরি হয়েচে স্কুলে। ফিরে কুঠির মাঠে বেড়াতে যাই। ছেলেদের নিয়ে গল্প। রাত্রে ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। রবিবার।

আজ সকালে না খেয়ে স্কুল। ১টার সময় রওনা, ২টায় বাড়িতে। এসে তেল মেখে স্নান করে এলুম অত বেলায় বাঁশতলার ঘাটে।

খেয়ে শুই। লিখি। বেলায় উঠে আবার আমার সেই পেয়ারাতলার মাঠে বেড়াতে যাই। বেলা পড়েচে। ধুর ফুল ফুটেচে অনেক জায়গায়। বাড়ি এসে বসি। কল্যাণী গিয়েচে ও-পাড়ায় বেড়াতে। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি সন্ধ্যা জ্বালি। ইন্দুর বাড়ি বেড়াতে যেতে দেরী হয়। সন্ধ্যার পর রান্নাঘরে বসে চা খাই। হরিপদদার বাড়ি গিয়ে মীমাংসা করি মোকর্দমার। আবার ইন্দুর বাড়ি। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৯৪৫ সালের দিনগুলিতে উল্লিখিত ব্যক্তি, স্থান এবং ঘটনার টিকা

১. চাল্‌কী : লেখকের স্বগ্রাম বারাকপুর-এর সংলগ্ন গ্রাম। বনগ্রাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

২. বারিক : বারিক মণ্ডল, লেখকের প্রজা, চাল্‌কী গ্রামবাসী। এঁকে নিয়ে লেখকের বিখ্যাত গল্প

'বারিক অপেরা পার্টি'।

৩. সুশুভ্র বামন : White Dwarf শ্রেণীর নক্ষত্র। অনুবাদ লেখকের নিজস্ব।

৪. ওমিক্রন সেটি : Omicron Ceti, Cetus মণ্ডলীর যুগ্ম নক্ষত্র।

৫. জাঙ্গিপাড়া : হুগলীজেলার গ্রাম, লেখকের প্রথম কর্মস্থল।

৬. মিতে : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, লেখক-এর বনগ্রামবাসী বাল্যসুহৃদ।

৭. বুদ্ধদেব : সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু।

৮. অরুণেন্দ্রমণি : সাহিত্যিক অপূর্বমণি দত্ত-র পুত্র, কলিকাতাবাসী।

৯. অন্নদাশংকর : সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়।

১০. কানুমামা : নিরঞ্জন চক্রবর্তী, লেখকের ছোট মামাশ্বশুর।

১১. Lady Bose : লেডি অবলা বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী।

১২. উৎপলা : প্রখ্যাত গায়িকা উৎপলা সেন।

১৩. 'মধুর ভ্রমণ'(২৩.৮.৪৫) : এই নামে কোনো ভ্রমণকাহিনী পাওয়া যায়নি। হয়তো পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল।

১৪. বড় খুড়ো : পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, বারাকপুর গ্রামে লেখকের প্রতিবেশী।

১৫. উপেনবাবু : সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিচিত্রা'-র সম্পাদক।